চোখের বাহিরে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

জ্যোতি প্রকাশন
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ।। কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৮

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
দি তারকেশ্বর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯/৬, নরসিং লেন
কলিকাতা

॥ এক ॥

"সুদর্শনা। এই অন্ধকারে তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। হাঁ পাচ্ছি।

সুদর্শনা। কি রকম দেখছ?

নেপথ্যে। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগ-যুগান্তরের ধ্যান, লোক-লোকান্তরের আলোক, বহুশত শরৎ বসন্তের ফুলফল। তুমি বহু পুরাতনের নূতন রূপ।

সুদর্শনা। বলো বলো এমনি করে বলো। মনে হচ্ছে যেন অনাদিকালের গান জন্ম-জন্মান্তর থেকে শুনে আসছি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন করে? না, না, হবে না, মিলন হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব—সেইখানেই যে আমি আছি—"

এইখানেই টুনটুন পড়তে পড়তে থামল। বললে, পড়াটা ঠিক হচ্ছে তো সোনাদা?

আমি বললুম, নিশ্চয়। ঠিক সুদর্শনার গলা শুনতে পাচ্ছিলুম আমি।

টুনটুনের মুখ আমি দেখতে পেলুম না, তবু ঠিক বুঝতে পারলুম ওর গালে লজ্জার রঙ লাগল একটুখানি। টুনটুন বললে, যাও,—ঠাট্টা করতে হবে না।

—ঠাট্টা কেন? সত্যি—চমৎকার হবে তোর সুদর্শনা।

টুনটুন চুপ করে রইল। ওকে দেখতে পাচ্ছি না—ওকে কোনোদিন আমি দেখিনি। 'অরূপ-রতনের' রাজার মতো সেই চোখ আমার নেই।

শরৎ-বসন্তের পূর্ণতা ওর ভেতরে ফুলে-ফলে কতখানি যে ভরে উঠেছে, তা-ও জানবার উপায় নেই আমার। তবু কি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না? জানলা দিয়ে ভিজে ভিজে হাওয়া আসছে, অল্প অল্প উড়ছে ওর কপালের ঝুরো চুল, মাথাটি নামিয়ে তাকিয়ে আছে বইয়ের পাতার দিকে। হয়তো সুদর্শনার কথাই ভাবছে।

আবার শুনতে পেলুম টুনটুনের গলা। একটু বিমর্ষ, একটু অভিমানে আচ্ছন্ন।

—কিন্তু জানো সোনাদা, এখন ওরা আপত্তি করছে।

—ওরা কারা?

—কলেজের মেয়েরা।

—কেন, কী বলছে ওরা?

—বলছে ভারী শক্ত—কিছু বোঝা যায় না। নাটকটা ওরা বদলে নেবে।

শক্তই তো। আমিও এবারে চুপ করলুম। চোখ দিয়ে যারা দেখে, চেনে, জানে—চোখ না দিয়ে দেখার রহস্য কি তারা বুঝতে পারে কোনোদিন? কখনো তারা অনুভব করে সেই আলোকে—সূর্য যাকে প্রকাশ করতে পারে না? দেখতে পায় সেই রঙ—যাকে দেখা পায় না কখনো? সবাই তো রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনা নয়—অন্ধকারের রাজাকে সবাই তো খুঁজতে জানে না।

টুনটুন বললে, আচ্ছা সোনাদা?

—কি রে?

—ওরা বলছিল, 'ফাল্গুনী' করবে। কিন্তু তাতেও তো একই কথা। সবাইকে পথ দেখিয়ে যে নিয়ে যায় সেও তো অন্ধ বাউল। কেউ যখন কোনো নিশানা খুঁজে পায় না—তখন বাউলই তাদের পথ দেখাতে দেখাতে আগে আগে চলে। একই তো কথা—তাই না? যার চোখ নেই—সত্য তার কাছে সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়—এই কথাই তো কবি বলেছেন।

কী জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিলুম না। আর এই আলোচনাই বা এমন করে কেন তুলছে টুনটুন! আমাকে সান্ত্বনা দিতে চায়? বলতে চায়, আমি হারিয়ে যাইনি, মিথ্যে হয়ে যাইনি? সকলের চাইতে বড়ো সত্যের প্রকাশটা আমারি জন্যে অপেক্ষা করে আছে? হয়তো তাই। আমাকে ভোলাতে চায়—আশ্বাস দিতে চেষ্টা করে? ও আমার ছোট বোন হলে কী হয়—মায়ের মতো ওর মন। আমার কখনো কখনো ইচ্ছে করে ওকে ছোট মা বলে ডাকতে।

কাকিমার ডাক ভেসে এল: টুনটুন—টুনটুন—

—যাচ্ছি মা—টুনটুন সাড়া দিলে। বললে, আমি যাই সোনাদা, ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাস আছে। ইস্, রোদ পড়েছে যে তোমার গায়ে। জানলাটা বন্ধ করে দিই।

জানালা বন্ধ করার আওয়াজ পেলুম। একটা মৃদু উত্তাপ এতক্ষণ শরীরের ওপর খেলে বেড়াচ্ছিল, খানিক শীতল ছায়ার প্রলেপ পড়ল তার বদলে।

টুনটুন বেরিয়ে গেল।

আমি এখন একা। নিজেকে নিয়ে, নিজের মনটা নিয়ে, আর আমার যে শরীরটাকে আমি এখন দেখতে পাই না, তাকে নিয়ে। আমার চারদিক ঘিরে ঘিরে যে আলো ঘুরছিল—যে আকাশটা তাকিয়েছিল মুখের দিকে, সব মিলিয়ে গেল। এখন আবার নিঃসঙ্গ মনোমন্থনের পালা।

আকাশ! কতদিন আমি আকাশ দেখিনি।

অথচ যে আকাশ প্রথম আলোর ছোঁয়ায় পদ্মের মতো পাপড়ি মেলে দিত, যে আকাশে তারা উঠত, রামধনু দেখা দিত—তাকে আমি এখনো ভুলিনি। আজও তার কথা আমার মনে পড়ে।

কতদিন?

চোখ থাকলে হিসেব করতে হত, আঙুলে গণে গণে ঠিক করে নিতে

হত সময়। কিন্তু আমার সব হিসেব—আমার অনন্ত কাল একটা গণ্ডির মধ্যেই থেমে গেছে, আর আমায় হিসেব করতে হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাই।

অনেক দিন হয়ে গেছে, ষোলো বছর। তবুও মনে পড়ে পশ্চিম দিক থেকে গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে কালো মেঘেরা উঠে আসত দলে দলে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ছায়া; আর সেই মেঘের বুকের ভেতর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে চলা ঝড়-বৃষ্টির এক ঝাঁক চিঠির মতো শাদা শাদা বক উড়ে যেত দলে দলে। তখন বিনুনি দুলিয়ে দুলিয়ে দিদি—আমার চাইতে দু'বছরের বড়ো—গান গেয়ে উঠত :

'মেঘের কোলে কোলে যায়রে চলে বকের পাঁতি,
ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় যে ওরা গাঁথি গাঁথি—'

দিদি তখন গান শিখত। বাবাই শেখাতেন ওকে।

'যায়রে চলে বকের পাঁতি—'

ওই বকের দল কোথা থেকে আসে, কোনখানেই বা যায়, তা জানতুম না। দিনের আলো শেষ হয়ে গেলে—সারাটা রাত ধরে কোন মনোহরণ রাত্রির মায়ায় ওরা অলক্ষ্যের দিকে ছুটে চলত, তা-ও কি বোঝবার বয়েস ছিল আমার? গানের শেষ অংশটার কথা কোনোদিন ভাবিনি, বুঝতেও পারিনি। কিন্তু বকেরা সারাটা দিন কোথায় যে কাটাত—সে আমি দেখেছি।

আমাদের লাল রঙের দোতলা বাড়ীটার ছাতে উঠে দাঁড়ালে, একটা পুকুর, আমের বন আর কয়েকটা ঘর বাড়ী পেরিয়ে দেখা যেত ধূ-ধূ করছে নদী, তার নাম গড়াই। দেখতে পেতুম কত রঙের কত পাল-তোলা নৌকো চলেছে নদী দিয়ে। নদীর ওপারে কত দূর পর্যন্ত চলে গেছে বিরাট বালুচর। সেই চরে কত বনঝাউ দুলছে হাওয়ায় আর পূজোর দিনগুলো ঘনিয়ে এলে কত যে কাশ ফুটেছে কে জানে! দেখতুম খেয়া নৌকো এপার ওপার করছে; বাঁকে বাঁকে দুধ-দই

নিয়ে আসছে গোয়ালারা এপারের শহরের বাজারে, আসছে বোঝা কাঁধে মানুষ, ঝাঁকায় করে কুমোর আনছে হাঁড়িকুড়ি। আবার বিকেল বেলা খালি বাঁক খালি ঝাঁকা নিয়ে তারা ওপারে ফিরে যাচ্ছে, চরের ভেতর দিয়ে ছোট ছোট পুতুলের মতো মানুষগুলো কোথায় যে ঝাউবন আর কাশের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে—তাই বা কে বলতে পারে।

আমি দেখতুম গড়াই নদীর খানিক ফেনার মতো কিংবা হাওয়ায় উড়ে-আসা একরাশ কাশের মতো বকেরা বসে আছে সেই চরে—একেবারে জলের ধার ঘেঁষে। জলের কোণায় ওরা যে কিভাবে বসে থাকত সে-ও আমি জানি। মাথার ঝুঁটি খাড়া করে কখনো দু পায়ে, কখনো বা এক পা তুলে তারা দাঁড়িয়ে থাকত, লম্বা ঠোঁটের ছোঁ দিয়ে কখনো বা তুলে নিত রূপোর টুকবোর মতো এক-আধটা মাছ, কখনো কখনো ঘাড় বাঁকিয়ে কী যেন ভেবে পিঠের পালক খুঁটত, যে সব গোরু চরত লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘুরে বেড়াত তাদের পিছে পিছে, আবার কখনো বা কাঁ-কাঁ করে ডাক তুলত। গড়াই নদী দিয়ে যে সব নৌকো যেত, তাদের হিন্দুস্থানী মাঝিরা কখনো বা হাঁক দিয়ে বলত : এ ভাই বগুলা, তানি মাছোয়া খৈবো হো ?

কিন্তু আমি তো আকাশের কথা বলতে যাচ্ছিলুম। এর মধ্যে কোথা থেকে নদী এসে গেল। এতদিন পরে—অন্ধকারের একটানা স্রোতের ভেতর দিয়ে ষোলোটা বছর পেরিয়ে যাওয়ায় পর, কোনো কিছুকে আর আলাদা করে দেখতে পাই না আমি। আকাশ-পাখী-নদী-নৌকা-আমের বন—সব মিলে আমার হারিয়ে যাওয়া আলোর একটা রূপ মনের সামনে স্থির হয়ে রয়েছে। জিনিসটা কি রকম বলি। এই যে আমার বেতের ডেক চেয়ারটা, তার সামনে একটা বড়ো গোল টেবিল রাখা আছে। এই টেবিলে আমার জন্যে চা আসে, খাবার আসে, দুধের কাপ আসে, নানা টুকিটাকি এটা ওটা জিনিস আসে। আমি জানি, টেবিলটা গোল। হাত বুলিয়ে তার যেটুকু আমি পাই—আমার জলের

গ্লাস, দুধের পেয়ালা কিংবা খাবারের প্লেট, তাই-ই আমার সীমানা। অর্থাৎ ওই গোল জায়গাটুকুই একটা গ্লোবের মতো আমার সমস্ত পৃথিবী, সেটাকে অনায়াসে এক সঙ্গে হাতের মধ্যে আমি পেতে পারি, আমার খিদে তেষ্টা মেটাবার সম্পূর্ণ আয়োজন সেখানেই রয়েছে। তার বাইরে সব ফাঁকা, সবই শূন্যতা।

ঠিক তেমনিভাবে ষোলো বছরের ওপারে যখন তাকাই—তখন এই অন্ধকারের দিনগুলোকে দূরবীক্ষণের একটা কালো নলের মতো আমার মনে হয়; সেই নলটা পেরিয়ে চোখ একটা বৃত্তাকার ফোকাসের ওপর পড়ে। আমার স্মৃতি সেই বৃত্ত। একটা লাল দোতলা বাড়ী, তার ছাত, আমের বাগান, টিনের ঘর কতগুলো, একটা কাঁচা মাটির পথ, মেঘের সাঁতার কাটা আকাশ, গড়াই নদী আর তার চর, বন ঝাউ, কাশের সারি, বকের দল, বাঁক কাঁধে নিয়ে চওড়া-বুক গোয়ালাদের হনহন করতে করতে চলে যাওয়া, মহাজনী নৌকোর মাঝিরা ঝুঁকে পড়ে নদীর জলে তাদের পেতলের থালা ধুয়ে নিচ্ছে, তার ছবি। এই গোল টেবিলটার কোনো অংশকে যেমন আলাদা করে আমি ভাবতে পারি না, তেমনি ষোলো বছর পর্যন্ত লম্বা একটা কালো নলের দূরবীণ দিয়ে আলোর একটা বিশেষ রূপ আমি দেখতে পাই, তাতে মাটি জল আকাশ সব একসঙ্গে রয়েছে, কোনোটা থেকেই কাউকে আলাদা করে নেবার জো নেই।

একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। কয়েকটা লাইন গুনগুনিয়ে যাচ্ছে মনে। ধরা দিচ্ছে, ধরা দিচ্ছে না। তবু চেষ্টা করে দেখি। সন্ধ্যাবেলা টুনটুনকে শোনাব।

ছন্দটা চেনা-চেনা ঠেকছে। এমনি কারো একটা কবিতা টুনটুন শুনিয়েছিল সেদিন। তা হোক, কবিতার নিয়মই তো তাই। ‘প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।’ এক প্রদীপ থেকেই আর এক প্রদীপ জ্বলে, আসে দীপাবলী।

ব্রেল-এর যন্ত্রটা টেনে নিলুম।

যদি পাণ্ডু গগনে কভু
সন্ধ্যা তারা
সখি, তাকায় তোমার মুখে
তন্দ্রাহারা ;
বন পথের বাঁকে
শুধু ঝিল্লী ডাকে,
জাগে আঁধার নদীর জলে
ছন্দ ধারা—

সেই নদীর ছবিই আসছে। সেই পথের বাঁক, সেই ঝিঁঝিঁডাকা সন্ধ্যা। আমার স্মৃতির বৃত্তির ভেতরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে মনটা। কিন্তু লেখাটা আমার ভালো লাগছে ঃ

দূরে হাসবে খণ্ড শশী
বনের শিরে
ঘন শ্রান্তি ঘুমের মতো
নামবে ধীরে ;
সেই কাজল ছায়া
সখি, আনবে মায়া
মধু, গন্ধ মদির
হেনা কুঞ্জ ঘিরে—

কিন্তু এ যে প্রেমের কবিতা। একি শোনানো যাবে টুনটুনকে ?

আমি লেখা থামালুম। আমার আলোর বৃত্তে বাঁধা দিনগুলো—সে তো ছেলেবেলার স্মৃতি। তার ভেতরে কোথা থেকে প্রেম এল, কেমন করেই বা এল ? যে সখীর কথা বলছি—সে কেমন দেখতে ? যে মেয়েরা ভালোবাসে, যারা ব্যথা পায়, যারা হাসিকান্নার হীরাপান্না ঝরিয়ে জীবনকে অপরূপ করে তোলে—আমার নিরালোক চোখে তাদের আমি কেমন করে দেখব ? কবিতায় তাদের বর্ণনা পড়েছি,

পড়েছি উপন্যাসে। কালিদাসের পংক্তি ভেসে আসে মনের কাছে : 'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং।' রবীন্দ্রনাথের গানের লাইনে বাঁধা পড়েছে সেই ছবিটি : 'অমল-শরত-শীতল-সমীর বহিছে তোমারি কেশে, কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার অধরে পড়েছে এসে।' কে সে মেয়েটি ? ষোলো বছর আগেকার নদী-জল-বাতাস তিলে তিলে তিলোত্তমা করে গড়ে দিয়েছে যাকে ?

রঞ্জা ? রঞ্জা দাশগুপ্ত ?

ভারী পায়ের শব্দ বাইরে। চিনতে পেরেছি। কাকা আসছেন।

—কেমন আছিস আজ ?

চেয়ার টেনে বসলেন। যে চেয়ারটায় টুনটুন বসেছিল কিছুক্ষণ আগেই।

কাকা আবার বললেন, শরীর ভালো আছে তো ?

কালকে একটু জ্বর জ্বর হয়েছিল। সেইজন্যেই এই কুশল জিজ্ঞাসা করছেন।

—আজ বেশ আছি।

—সারাদিন একা একা লাগে না ? কোনো অকুপেশন তো নেই।

জানি, কাকা কী কথাটা বলতে চাইছেন। কিন্তু সেদিকেই আমি গেলুম না।

হেসে বললুম, আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। তা ছাড়া টুনটুন আমাকে প্রায়ই এটা-ওটা পড়ে শোনায়।

—তবু একটা ভ্যাকুয়াম তো। একটু ভেবে দেখব কী করা যায় তোকে নিয়ে। আচ্ছা উঠি তবে—আমার কোর্টের বেলা হল।

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। এ্যাডভোকেট মানুষ। মোটা ভারী গলা। টুনটুন কী করে যে ওঁর মেয়ে হল ভাবতে অবাক লাগে। হয়তো স্বভাবটা পেয়েছে কাকীমার কাছ থেকেই। কাকীমার গলার আওয়াজও সুন্দর—ঠাণ্ডা মানুষ, কোনোদিন রাগ করেছেন বলে মনে করতে পারি না।

আবার লেখায় মন দিলুম ঃ

তবে একটি প্রদীপ জ্বেলে
আপন হাতে
সেই বিজন নদীর তীরে
নিঝুম রাতে,
সেই শ্যামল ছায়ে
ধীর চপল পায়ে
যেন আসবে স্বপ্নময়ী
কল্পনাতে—

টুনটুন শুনলে হয়তো বলবে, এ কবিতা সেকেলে। আজকাল এসব ছন্দ অচল, এ ভাষা পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু আমিও তো আমার পুরোনো পৃথিবীতেই মুখ গুঁজে বসে আছি, আমার বাইরের জগৎ বলে কিছু নেই, একালের সঙ্গে কোনো যোগ নেই কোনোখানে। কিন্তু এ প্রেমের কবিতা। এ কখনোই টুনটুনকে শোনানো যাবে না।

॥ দুই ॥

কবিতাটা শেষ করেছি।

সখি, তোমার প্রদীপখানি
চলবে ভেসে
কোথা আমার আয়ুর পারে
নিরুদ্দেশে।
কালো আকাশ তলে
কালো উছল জলে

কোন্ ছাড়িয়ে পথের সীমা

কালের শেষে,

নভে সন্ধ্যাতারা যবে

উঠবে হেসে।

আমার নিজের কান খুশি হয়েছে, মনের মধ্যে ছবি জেগে উঠেছে কতগুলো। তবু সন্ধ্যেবেলা টুনটুন যখন এল, তখন ওকে কিছুতেই এটা শোনানো গেল না। যেন এ আমার একান্ত গোপন কথা, নিজের ডাইরি। এর ভাষা পুরোনো, ছন্দ পুরোনো। কিন্তু আমিও তো পুরোনো হয়ে গেছি, আমার কাছেই এ লুকোনো থাক।

টুনটুন এল।

—সোনাদা?

—কী খবর?

—ওরা 'অরূপ রতন' করতে রাজী হল না। ফাল্গুনীও বাদ দিয়েছে। —টুনটুনের স্বর বিষণ্ণ।

—কী ঠিক হল তা হলে?

—'মুক্তধারা।' সবাই মিলে ভোটে পাস করিয়ে নিলে।

—সেও তো ভালোই।

আমার কপালে এক গুচ্ছ চুল উড়ে এসে পড়েছিল, নরম আঙুলের আল্‌তো ছোঁয়া বুলিয়ে টুনটুন সেগুলোকে সরিয়ে দিলে। এত মিষ্টি ওর আঙুলগুলো! সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে যায়।

টুনটুন বললে, তবু অরূপ রতনই আমার ভালো মনে হয়েছিল। আমাকে সুদর্শনার পার্ট দিয়েছিল। জানো, আমি রাত্রে জেগে জেগে ভেবেছি অন্ধকারের রূপ। ভাবতে চেয়েছি সে রাজা কেমন—যাকে দেখা যায় না, যার রূপ নেই—অথচ যে জ্যোতির্ময় হয়ে দু চোখকে পূর্ণ করে দেয়।

আমি চুপ করে রইলুম। আমার কথা ঠিক উল্‌টো। আমি যদি রূপের জগতে ফিরে যেতে পারতুম! অন্ধকারের রাজাকে আমি চাই

না—যদি সুবর্ণ এসে আমার মন ভোলাতে পারত! যদি বসন্তোৎসবের অশোক-কিংশুকের সঙ্গে আমিও রঙের আনন্দে মাতাল হয়ে উঠতে পারতুম!

টুনটুনকে জিজ্ঞেস করলুম, কী পার্ট দিয়েছে তোকে?

—এখনো ঠিক নই। কাস্টিং হবে কালকে।

তারপর কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প। ওদের কলেজের স্পোর্টসের কাহিনী। ফোর্থ ইয়ারের মোটা মেয়ে মণিকা ঘোষ মিউজিক্যাল্ চেয়ারে বসতে গিয়ে কী করে চেয়ার ভেঙে পড়ে গিয়েছিল তার সরস বিবরণ।

টুনটুন যেন মনের ভেতরে খানিকটা বসন্তের বাতাস বইয়ে দিয়ে গেল। বার বার ইচ্ছে হল, কবিতাটা ওকে পড়ে শোনাই। কিন্তু সাহস হল না। নিজের কথা নিজের কাছেই লুকিয়ে থাকুক।

টুনটুন চলে গেলে আবার ব্রেল নিয়ে বসেছি। না—কবিতা লিখব না। এবার আবার সেই পুরোনো দিনগুলোর ভেতর ফিরে যেতে চাইব। অতীত ছাড়া আমার আর কী আছে?

আকাশের কথাই বলছিলুম।

আমার ন'বছর বয়েসের স্মৃতির সীমাটা একদিকে ছুঁয়েছে সেই আকাশকে—যে আকাশে মেঘের পরে মেঘ উঠে আসে; আর আমাদের লাল দোতলা বাড়ীটা, আমের বাগান, ছোটোবড়ো কাঁচাপাকা বাড়ী—একটা ধুলোবালি ভরা পথ বেয়ে গড়াই নদীর ডাঙা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আমার সামনে গোল টেবিলটার মতোই তারপরে আর কিছু নেই—সব ফাঁকা, সব অন্ধকার। এই টেবিলটা যেমন এখন আমার প্রয়োজনের জগৎ, তেমনি ঐটুকুই আমার আলোর পৃথিবী, আমার স্মৃতির সঞ্চয়।

তার মধ্যে বাবাকে দেখতে পাই।

সকালের রোদে—শীতের মিষ্টি নরম আলোয় সামনের ছোট কম্পাউণ্ডটিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। পাশের টিপয়ের ওপর

চায়ের পেয়ালা, পায়ের কাছে গুটিশুঁটি মেরে বসে আছে টমি কুকুর : দিশী কুকুরের বাচ্চা—লালে সাদায় রঙ, পুষতে হয়নি, আপনিই কখন এসে জুটে গেছে। আমাদের চাকর শম্ভু দেওয়ালীর দিনে ওর ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দিয়েছিল, তারপর টমির সে কি দৌড়। একবার করে পেছনের দিকে তাকায়, তারপর প্রাণপণে ছোটে !

আর দেখছি মা-কে। বাড়ীর টুকিটাকি কাজ নিয়ে সামনের বারান্দাটা দিয়ে আসা-যাওয়া করছেন মাঝে মাঝে। শাড়ীর লাল পাড় ঝকঝক করছে—জ্বলজ্বল করছে কপালের সিঁদুরের টিপ। দিদিকে দেখছি—একটু আগেই স্কিপিং করছিল, এখন বিনুনী দুলিয়ে দুলিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ছাগলছানার পেছনে, গান গেয়ে উঠছে : 'এই তো ভালো লেগেছিল, আলোর নাচন পাতায় পাতায়।' আর আমি সেই তখন থেকে লক্ষ্য করে দেখছি—মরা মরা ঘাসের ভেতর একটা ঝিঁঝিঁ ধ্যানীর মতো নিথর হয়ে বসে আছে।

—এরোপ্লেন—দিদি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। মা বেরিয়ে এলেন, বাবা উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, এমন কি টমি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গিয়ে মুখ তুলে ল্যাজ নাড়তে লাগল। রাস্তার দিক থেকে লোকের চিৎকার উঠল।

শীতের নরম আলোয় একটা রূপোর পাখি উড়ে গেল ঘরঘর শব্দ করতে করতে। দেখতে ঢেঁকির মতো—দুধারে মইয়ের মতন তার ডানা।

মা বললেন, কী দস্যিপনা বাপু ! নীচে পড়লে তো আর হাড়গোড় কিছু থাকবে না।

বাবা হাসলেন, জবাব দিলেন না।

আমি বললুম, বড়ো হয়ে আমি এরোপ্লেনে চড়ব।

এই কলকাতা শহরে এখন রাতদিন এরোপ্লেনের সাড়া পাই। কর্কশ শব্দে আকাশ ছিঁড়ে চলে যায়—কেউ লক্ষ্য করে না—কেউ

চিৎকার করেও ওঠে না। এখন ভাবি, আমিও একটা প্লেনে করে কোথাও চলেছি। পথের শেষ নেই, আকাশের সীমা নেই, অন্ধকারের পরে অতল অন্ধকার।

কিন্তু এখনকার কথা আর নয়। আমাদের দোতলার জানালা পর্যন্ত যে চাঁপা ফুলের গাছটা উঠে এসেছিল, সোনা রঙের ফুলে ফুলে তার পাতাগুলো ছেয়ে গেলে গন্ধে যখন নেশা ধরত, তখন কতদিন ভেবেছি, আমিও এরোপ্লেনে চড়ে কোথায় কোথায় চলে যাব। এই গড়াই নদী পার হয়ে—সমুদ্রের উপর দিয়ে—মেঘের ভেতর দিয়ে পাড়ি জমিয়ে কোথায় যে কতদূরে অদৃশ্য হয়ে যাব। আর তখন দেখব, নদীর চরের বকেরা আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিনা।

সেই নদীর চর।

এক একদিন বিকেলে বাবা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতেন গড়াই নদীর ধারে। জল চলেছে ছলছলিয়ে। কত জল—কত দিন ধরে বয়ে আসছে, কিছুতেই ফুরোয় না। খেয়া নৌকো করে গোয়ালারা বাঁক কাঁধে ওপারে চলে গেল—চরের ওপর শোঁ-শোঁ করা বনঝাউ আর কাশবনের মধ্য দিয়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেল!

ওপারে ঝুঁটিওলা বকেরা মাছ ধরছে তখনো। দিদি চিৎকার করে ডাকত :

'বক মামা, বক মামা, পান দিয়ে যা,
নারকেল গাছে কড়ি আছে, গুনে নিয়ে যা—'

নদীর অতদূর ওপারে তারা কি সে ডাক শুনতো পেতো? কিন্তু আমি ভাবতুম, বক মামার কাছে পান চাইতে যাব কেন, মাছ চাইলেই তো ভালো হয়। কিন্তু তারা পান তো দিতই না, মাছও নয়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত, গা খুঁটত, টুকটুক করে মাছ ধরে—গলাটা ওপরে তুলে যেমন করে লোকে কুইনিন খায়—তেমনি ভাবে টুপ করে গিলে ফেলত। আর চমকে উঠত দু-একটা মাছরাঙা—যারা একই

মতলব নিয়ে আধডোবা একটা ভাঙা নৌকোর গলুইয়ের ওপরে ঝিম ধরে বসে আছে।

আর সামনে দিয়ে যেত মহাজনী নৌকো : কখনো পাল তুলে, কখনো লগি ঠেলে, কখনো গুণ টেনে। ঢোল বাজিয়ে, করতালের ঝমঝম তুলে। বাবা বলতেন, ওতে করে ধান-পাট এই সব যায়।

আস্তে আস্তে বেলা ডুবত। গড়াই নদীর জল রূপোর রঙ বদলে তামার মতো হয়ে যেত। তারও পরে সূর্য যখন লাল হয়ে নামতে শুরু করত বনঝাউ আর কাশবনের ওপারে—রাঙা টকটক করত চরটা—যেন আগুন লেগেছে, আর কাশের মাথাগুলো সেই আগুনের অসংখ্য শিখা হয়ে জ্বলছে ; ওপারের মানুষগুলো যেন একদল রঙিন পুতুলের মতো টুকটুক করে এগিয়ে যেত। আর নদীতে রাঙা হত নৌকোর পাল—আবির মাখা জলে এক আধটা শুশুক খুশিতে ভুস ভুস করে ভেসে উঠত। তখন বকেরা সেই রঙে ডানা রাঙিয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ত আকাশে—ডাকত, কাঁ-কাঁ-কাঁ। তারপর আগুনধরা চরটার ওপর ছাই রঙ ছড়িয়ে যেত, সারাদিনের মতো খেয়ার পালা মিটিয়ে এপারে ফিরে আসত মাঝিরা, নদীর আবির গোলা জল মলিন হয়ে যেত। খানিক দূরে বাঁকের মুখে গাছপালার আড়ালে দেখা যেত পুরোনো নীলকুঠির বাড়ীটাকে—সেইটেকে ঘিরে ঘিরে একটা কালো ছায়া উঠতে থাকত আকাশের দিকে। অন্ধকার মাখতে আরম্ভ করত পেছনের মস্ত আমবাগানটা—শেয়াল ডেকে উঠত তার ভেতরে।

তখন বাবা বলতেন, ফিরে চলো।

আমরা বলতুম, আর একটু থাকি না বাবা!

বাবা বলতেন, না-না, অন্ধকার হয়ে যাবে এর পরে।

তখন আমরা ফিরে আসতুম বাড়ীর দিকে। আসবার সময় নদীর চড়া থেকে আকি ঝিনুক কুড়িয়ে নিতুম দুটো-একটা। কাঁচা আম খেতে ঝিনুক খুব কাজে লাগে। অনেকদিন ভেবেছি একটা গোটা ঝিনুক যদি পাই, তাহলে তার ভেতরে মুক্তো পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করে

দেখব। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো গোটা ঝিনুক আমি পাইনি—সব ভাঙা।

আমরা বাড়ীর দিকে ফিরে আসতুম। কোনো কোনোদিন বাবার হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে অনেকখানি এগিয়ে যেতুম আমি। বাবা বলতেন, আস্তে আস্তে। চলতে চলতে ঝোপের মধ্যে ঝুমঝুম করে আওয়াজ পেতুম কোনো-কোনো দিন—মনে হত কে যেন যাচ্ছে মল পায়ে দিয়ে—সজারু যেত কাঁটা বাজিয়ে বাজিয়ে। কান খাড়া-করা খরগোস লম্বা লাফ দিয়ে দেখতে না দেখতে কোথায় উধাও হয়ে যেত। তারপর দেখা দিত অন্ধকার আমের বাগানটা। দিনে কত নীল নীল ছায়া—কী ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাসে ভরা, আর সন্ধ্যে নামলেই অদ্ভুত চেহারা, চেনা গাছগুলোকেও কেমন একঠেঙো ভূতের মতো বলে মনে হতে থাকে। তখন আর আমার ফালো লাগত না—হাতে বাবার ছড়িটা থাকে সত্ত্বেও নয়। আমি পিছিয়ে এসে বাবার কোল ঘেঁষে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করতুম। বাবা তখন দিদিকে বলতেন, পরী. গান ধর।

ওইটেই দিদির ডাক নাম ছিল।

দিদি গান ধরত ঃ

'চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে,
অন্তরে আজ দেখব, যেথায়
আলোক নাহিরে—'

বাবার খুব প্রিয় গান ছিল এটা। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, সেইখানেই শিখেছিলেন গান। বলতেন, স্বয়ং গুরুদেব আমাদের পড়াতেন—তা জানিস? আর গান শিখিয়েছেন দিনু ঠাকুর নিজে। সে বরাত তোরা পাবি কোথায়? তবে ভাবছি, আর একটু বড়ো হলে খোকাকে পাঠাবো শান্তিনিকেতনে।

শান্তিনিকেতন! আমার চোখের আলোয় সে তো কখনো দেখা

দিল না। তাই যেখানে আলো নেই, সেখানেই তাকে আমি দেখতে পাই। কী দেখতে পাই? সে কথা কাউকে বলা যাবে না—সে আমার নিজের জন্যেই থাকুক।

কিন্তু যে কথা বলছিলুম।

চলতে চলতে দিদি গান গাইত, আর বাবাও গলা মিলিয়ে দিতেন তার সঙ্গে। 'ধরায় যখন দাওনা ধরা, হৃদয় তখন তোমায় ভরা'—

কিন্তু আমার ভালো লাগত না। সেই দশ-এগারো বছরেও না। অন্ধকারের সঙ্গে আমার মনের মিতালি হয়নি কখনো, কোনোদিন অন্ধকারকে আমার পছন্দ হয়নি। আলোর রঙ দেখেছি সকাল দুপুর-সন্ধ্যায়, দেখছি শিশিরে ভেজা ঘাসের ওপর, পাতার ঝিলিমিলিতে—নদীর জলে; পাখির রঙ দেখেছি—শালিক, দোয়েল, মাছরাঙা, বউ কথা কও। আমাদের বাগান ভরে জুঁই ফুটত—গাঁদা ফুলে আলো হত উঠোন—দোপাটি যেন রঙের মেলা বসিয়ে দিত। আমাদের গড়াই নদীর ওপর কত রঙ যে খেলা করে বেড়াত—বর্ষার মেঘ করলে, শরতের কাশ ফুটলে—এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর তার এ-পার ও-পার জুড়ে মস্ত একটা রামধনু উঠলে। আর সব চাইতে ভালো মা-র কপালের সিঁদুরের রঙ—তাঁর শাড়ীর পাড়ের লাল টকটকে রঙ; পান খেয়ে ঠোঁট দুটি টুকটুকে হয়ে উঠলে সেই রঙ, হাতের সোনার চুড়ির সঙ্গে জড়িয়ে দু'গাছা শাদা শাঁখার রঙ।

এত রঙ—এত রঙ আছে পৃথিবীতে। তবু অন্ধকার সব কিছুই মুছে নেয়, কালো করে দেয়—একাকার করে ফেলে। বাবা আর দিদির ওই গানের সুর আমার মনের ভেতরে যেন আরো বেশি করে ভয়ের ছায়া ছড়িয়ে দিত। আমি বাবার একখানা হাত জড়িয়ে ধরে দেখতুম, আমের বাগানটার ভেতরে সারি সারি একঠেঙো কেমন অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কুল গাছের মাথায় কত অসংখ্য জোনাকি ঝিকমিক করে জ্বলছে।

রঙের নেশা সেই বয়সেই আমাকে পাগল করে দিয়েছিল।

হয়তো বড়ো হলে আর্টিস্ট্ হতুম আমি, পৃথিবীতে যত রঙ আছে সব ধরে আনতুম তুলির মুখে; সন্ধ্যার আকাশকে অমন করে রাজকন্যার মতো সাজিয়ে দেবার রহস্যটা আমি মেঘের কাছ থেকে শিখে নিতুম, গড়াই নদীর আবীরমাখা জল এনে ছিটিয়ে দিতুম ছবির গায়ে —বউ কথা কও পাখির হলুদ রঙ এনে গায়ে হলুদের ছবি আঁকতুম।

কিন্তু রঙ আমার কাছে ধরা দিল না।

তার বদলে যে এল, তাকে আমি কোনোদিন চাইনি। সে অন্ধকার।

দিনের আলো ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন আমার খারাপ হয়ে যেত। ঘরে যে লণ্ঠনটা জ্বলত—তা আমার মনকে সাহস দিতে পারত না। লণ্ঠনের আলোয় যেটুকু দেখি, তার বাইরে অনেক কিছুই আমি দেখতে পাই না—মনে হয়, আমবাগান থেকে সেই একঠেঙো ভুতুড়ে মূর্তিগুলো সন্ধ্যার সুযোগ নিয়ে আমাদের পিছে পিছে কখন নিঃশব্দে চলে এসেছে, গোল হয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে—যেন অপেক্ষা করে আছে সবাই; বাতাস নয়—তারাই ফুঁ দিয়ে চলেছে একটানা— আলোটা একবার নেবাতে পারলেই আমার ওপর এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

তাই বরাবর রাত্রে আমার মাথার কাছে একটা ছোট আলো জ্বালা থাকত। অন্ধকার হলেই আর আমি ঘুমুতে পারতুম না। বাবা মধ্যে মধ্যে রাগ করতেন। দিদি বলত, ছি ছি, এত ভয় পাস কেন? পুরুষ মানুষ না তুই? জানিস, আমি রাত্তির বেলা আলো না নিয়েও ছাতে যেতে পারি?

আমি বলতুম, বেশ যা তো।

দিদি বলত, আজ নয়—আর একদিন যাব। আজ আমার শরীরটা ভালো নেই।

আসল কথা, ওরও সাহস ছিল না। শুধু বাহাদুরী দেখাবার জন্যেই বলত। কিন্তু তাই বলে আমার মতো অত ভয়ও ওর ছিল

না—বারান্দায় লণ্ঠন না থাকলেও ও ঠিক উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে চলে যেতে পারত।

কিন্তু আমি অন্ধকারকে চাইনি—একেবারেই চাইনি।

অথচ শেষ পর্যন্ত সেই-ই নেমে এল আমার দু'চোখের পাতার ওপর। আমি কিছুতেই তাকে সরাতে পারলুম না। সেই এগারো বছর বয়সেই আমার দেখার জগৎটাকে সে সম্পূর্ণ কেড়ে নিলে—যার ভেতরে কোনোদিন সূর্যের আলো ফুটবে না—কখনো দেখা যাবে না ফুলের রঙ, পাখির রঙ।

কতদিন ভেবেছি, এমন তো হতে পারে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখব আমার দৃষ্টি খুলে গেছে; জানালা দিয়ে ভোরের আলো ফুটেছে, তার গরাদ বেয়ে ফুলে ভরা লতা ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়েছে, আর মা এসে দাঁড়িয়েছেন আমার মাথার কাছে। কপালে তাঁর সিঁদুরের টিপ, লাল টকটক করছে শাড়ীর চওড়া পাড়টা।

কিন্তু—

[ব্রেল সিস্টেমে খুটখুট করে এই পর্যন্ত কাগজের ওপর লিখেছি, হঠাৎ চমকে থেমে গেলুম। বাইরের রাস্তায় কিসের গণ্ডগোল উঠেছে একটা। কে যেন অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করছে, কারা বলছে, 'মার—মার—মেরে তক্তা করে দে ব্যাটাকে।' হয়তো মাতাল—হয়তো বা পকেটমার ধরা পড়েছে একটা। কিন্তু আমার লেখার সুরটা কেটে গেল। গড়াই নদী নেই—সে লাল বাড়ীটা নেই—বৌ কথা কও এখানে চোখেও পড়ে না। এমন কি, রাতের অন্ধকারে কুলগাছের গায়ে সেই লক্ষ লক্ষ জোনাকিও এখানে ঝিলমিল করবে না কোনোদিন। আমি আবার ফিরে এসেছি কলকাতা শহরে। আর ঠিক বড় রাস্তার ওপরেই আমার ঘরখানা।

হালকা পায়ের শব্দ। কতদিন—কতকাল ধরে ও শব্দ আমি চিনি। পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের পায়ের আওয়াজের সঙ্গে মিশে গেলেও আমার চিনে নিতে ভুল হবে না। মা।

কট্ করে সুইচের শব্দ হল। তা হলে ঘরটা এতক্ষণ অন্ধকার ছিল। আমার এইটুকুই সুবিধে। যখন খুশি আমি লিখতে পারি—সারা কলকাতার সব আলো চিরদিনের মতো নিবে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না।

মা কাছে এলেন।

—এখনো শুস্‌নি বাবা? রাত হয়েছে যে?

—ক'টা বাজল মা?

—প্রায় সাড়ে এগারোটা। কী করছিস এতক্ষণ ধরে?

—লিখছিলুম অল্প অল্প।

—হুঁ, সেই আওয়াজ পেয়েই তো আমি এলুম। কিন্তু আর দেরী কোরো না। এবার শুয়ে পড়ো।

মা আমার কপালে হাত রাখলেন। টুনটুনের আঙুলগুলো আমার মনে পড়ল—কিন্তু সে ছোঁয়ার স্বাদ এত ভরা নয়—এত গভীর নয়। টুনটুনের হাত পাপড়ির মতো, মা-র হাত পদ্মের মতো। আর সেই ভরাট হাতখানার ছোঁয়া লেগে আমি এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, আমার মাথা ধরেছে, দপদপ করছে কানের দু'পাশের শিরা দুটো।

মা বললেন, একি—কপাল গরম ঠেকছে কেন?

—ও কিছু নয় মা—সর্দির জন্যে হয়ে থাকবে।

—তুমি আমায় ভোগাবে দেখছি। নাও—শুয়ে পড়ো।

—আর দশ মিনিট মা, ঠিক দশ মিনিট। কয়েকটা কথা মনে এসেছে, এখন না লিখে রাখলে সব ভুলে যাব।

—না, পাঁচ মিনিট। তার বেশি কিছুতেই নয়। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে যদি তোমার লেখার আওয়াজ পাই, তা হলে এসে কিন্তু জোর করে শুইয়ে দিয়ে যাব।

মা আমার চুলগুলোকে নিয়ে আদর করছিলেন, যাবার আগে আর একবার সেই ভরাট নরম ছোঁয়া বুলিয়ে গেলেন আমার কপালে। আট-ন বছর বয়েস থেকেই ওই ছোঁয়াটার কথা আমি মনে করতে পারি।

তারপর কত বছর পার হয়ে গেল, কত ঝড়-ঝাপটা চলে গেল এর ভেতর দিয়ে। মা-র হাতের সোনার চুড়িতে আর ঝঙ্কার ওঠে না, আমি জানি সে শাদা শাঁখা দুটোও আর নেই, আজ চার বছর হল বাবা চলে গেছেন। তবু মা-র এই ছোঁয়াটুকু বদলায়নি—কোনোদিনই কি বদলায়?

আবার কট্ করে সুইচের আওয়াজ। মা আলো নেবালেন।

আমার হাসি পেলো। আজ কত সহজেই মা ঘরের আলো নিবিয়ে দিতে পারেন। আজ আর আমার রাত্রিকে ভয় নেই—অন্ধকারকে ভয় নেই। আলো জ্বলুক আর নাই জ্বলুক, আমার কিছুই তাতে আসে যায় না।

দরজার সামনে পর্যন্ত গিয়ে মা থেমে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারলুম।

জিজ্ঞেস করলেন, কিছু লাগবে?

—না মা, কোনো দরকার নেই।

কোনো দরকার নেই? একটু ছিল। আরো খানিকক্ষণ যদি মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। এতক্ষণে বুঝতে পারছি, সত্যিই দারুণ ভাবে ধরেছে মাথাটা। আরো একটুখানি পদ্মের মতো ভরা হাতখানা সেখানে থাকলে সব জুড়িয়ে যেত। কিন্তু কথাটা আমি বলতে পারলুম না—কেমন লজ্জা হল আমার। মা-রও তো সারাদিন খাটনি গেছে, এবার বিশ্রাম দরকার।

পথের গোলমালটা কখন থেমে গেছে, আস্তে আস্তে নিঝুম হচ্ছে চারদিক। এইবার আমি বুঝতে পারছি রাত হয়েছে। কলকাতার এই ক্লান্তিকে আমি চিনি। জানি, কিভাবে তার সমস্ত শব্দগুলো ধীরে ধীরে থেমে আসবে—তার সারা আকাশ লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসে ভরে যাবে। আমার জানলাটা দিয়ে সেই নিঃশ্বাসের স্পর্শটা যেন এখুনি ভেসে আসতে আরম্ভ করেছে।

আমি আবার লেখার যন্ত্রটায় হাত নামালুম। না—আর ভালো লাগছে না। ঘুমের ছোঁয়া আসছে হাওয়ায় হাওয়ায়। স্বপ্নেরা এখন ভিড় করে আসছে আশপাশে। এইখানেই আমার আর একটা জিৎ।

চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু স্বপ্ন দেখতে আমার কোনো বাধা নেই। সেখানে আমার দেখাকে কেউ আড়াল করতে পারে না।

হাত বাড়িয়ে বিছানাটা স্পর্শ করলুম—তারপর উঠে গিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিলুম তার ওপরে। কলকাতা এখন ঘুমোতে শুরু করেছে, কলকাতা এবার ঘুমিয়ে পড়বে। অথচ, এখানে কখনো আলো নেবে না। শুনেছি সারারাত ধরে তার পথে পথে বিদ্যুৎ জ্বলে—শূন্য নির্জন পথগুলো তার অকারণেই আলো হয়ে থাকে।

তবে কি কলকাতা আমারই মতো ভীরু? আমার মতোই আলো জ্বালা না থাকলে সে ভয় পায়?

তাই যদি, তা হলে একটা ঝড়ের রাতে—সমস্ত বিদ্যুতের বাতিগুলোকে চিরকালের মতো নিবিয়ে দিয়ে কেন আমার মতো অন্ধকারের দীক্ষা নেয় না? তা হলে আর কোনো ভয় থাকে না—ভাবনা থাকে না, একেবারে নিশ্চিন্ত, নির্ভয় হয়ে যেতে পারে।

'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি—'

কে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো—কে? রঞ্জা?

কিন্তু রঞ্জার কথা আর ভাবতে পারছি না—দু-চোখে আমার কলকাতার ঘুমের হাওয়া এসে লেগেছে। এইবার স্বপ্নের ভেতরে আমার অন্ধ চোখ নতুন করে খুলে যাবে—সেইখানেই স্মৃতির আলোতে রঞ্জাকে আমি দেখতে পাব। দেখতে পাব ষোলো বছরের ওপারে গিয়ে।]

॥ তিন ॥

আজ আর সারাটা দিন লেখার সুযোগ পাইনি। কাল থেকে যে কথাগুলো ক্রমাগত আসতে চাইছিল, সারাদিন ধরে তারা এক ঝাঁক ভোমরার মতো মাথার ভেতরে গুনগুন করে ঘুরে বেড়িয়েছে। অথচ, কিছুতেই হল না।

বিকেলে একটুখানি সময় পেয়েছিলুম, কাকা এলেন। একটা চিটিং কেসের গল্প করলেন অনেকক্ষণ। কেমন করে মিথ্যে বিল অফ্ লেডিং আর রেলওয়ে রসিদ বিক্রী করে ত্রিশ হাজার টাকা ঠকিয়েছে তার কাহিনী।

এ-সব বলা অনর্থক নয়। একটা কথা ঘুরছে কাকার চিন্তার ভেতর। ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছেন না এখনো। বাবার সঙ্গে কাকার অনেক তফাত। একই মায়ের পেটের ভাই—অথচ দুজনে কত আলাদা। বাবা ছিলেন সাহিত্য-পাগল মানুষ। তাঁর মুখেই তো প্রথম শুনেছিলুম লে মিজারেব্ল্স্ আর থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের গল্প, লাস্ট অফ দি মোহিকান্স্-এর কাহিনী। আরো বড়ো হলে বাবাই শোনাতেন শেলীর কবিতা—পাগল ছিলেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, আর কী ভক্ত ছিলেন ব্রাউনিঙের! কিন্তু ও-সব দুর্বলতা কাকার নেই। তিনি অ্যাড্ভোকেট, কাজের মানুষ—সময়ের চেহারা তাঁর কাছে অন্যরকম।

আচ্ছা, টুনটুন কী করে কাকার মেয়ে হল? ওতো আমার আপন বোন হতে পারত। আর তাইতেই ঠিক মানাতো ওকে।

কিন্তু টুনটুনের কথা এখন নয়। আমি রঞ্জার কাছেই ফিরে যাব।

আমার গোলটেবিলটার মতো স্মৃতির বৃত্তটাকে হাতড়াই। সেই চার বছরের ছোট পুতুলের মতো মেয়েটা। নামেও পুতুল। বাবা ছিলেন মুনসেফ—ওর বাবা সার্কল অফিসার। ওঁরা দুজন ছিলেন বন্ধু, আর পুতুলের মা ছিলেন আমার মা-র সই। কাছাকাছিই থাকতেন। আর প্রায়ই দুপুর বেলা পুতুলের মা বেড়াতে আসতেন আমাদের বাড়ীতে—সঙ্গে পুতুলও আসত বলাই বাহুল্য।

দিব্যি ফুটফুটে মেয়ে। আসত, সারা বাড়ী ঘুরঘুর করে বেড়াতো, আছাড় খেয়েও পড়ত কোনো কোনোদিন। কিন্তু তাতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। আমি আপত্তি করতুম অন্য কারণে।

ওর যত ঝোঁক ছিল আমার পড়ার টেবিলটার ওপর।

—তুই এখানে কেন ?—আমি গম্ভীর হয়ে বলতুম ঃ মেয়েদের ওখানে যা।

যেত না। টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে, এক-আধটা বই টেনে নিতে চেষ্টা করত।

আমি ধমক দিয়ে বলতুম ঃ এই—মারব। এ সব দিয়ে তোর কী দরকার ? ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি—কিছু বুঝতে পারবি ? যা—পালা এখান থেকে ;

কিন্তু যাবার মেয়ে সে নয়।

তখন বসে পড়ত মেজেতেই। একটা ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে থাকত ঃ ক-অ-অ—

—ঈস, কী পড়াই হচ্ছে ! যেন ম্যাট্রিক পাস করতে যাচ্ছেন !

সেদিন স্কুল থেকে এসে দেখি, পুতুল কোন্ ফাঁকে এসে আমার টেবিলে বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে। এক গাদা বই খাতা সব নীচে টেনে নামিয়েছে, আমার ভূগোলের বইতে পেনসিল দিয়ে নানারকম আঁকিবুকি কেটেছে, কালি ঢেলে দিয়েছে ড্রইংয়ের খাতায়, তারপর আমার একটা পুরোনো রাফ খাতাকে উল্‌টো করে ধরে বেশ মন দিয়ে পড়ে যাচ্ছে ঃ ক-খ-গ-অ-আ-খ-গ—

—অ-আ-খ-গ ? দাঁড়া—তোকে দেখাচ্ছি।

ভীষণ রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার। ঝুঁটিটা টেনে ধরে কষে একটা চড় বসিয়ে দিলুম। আর যাবে কোথায় ! সারা বাড়ী ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ল ঃ ভ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

মা আমাকে তেড়ে মারতে এসেছিলেন, কিন্তু পুতুলের মা-ই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন সে-যাত্রা। বললেন, ওর কোনো দোষ নেই দিদি, মেয়েটার স্বভাবই এই। ভয়ঙ্কর চুলবুলে। বাড়ীতেও ওই উৎপাত—সেদিন ওঁর অফিসের ফাইলে এক দোয়াত লাল কালি ঢেলে দিয়েছে। সে এক কাণ্ড !

এমন সাক্ষী-সাবুদ থাকতেও মা পুতুলের পক্ষই নিলেন।

রাগ করে আমাকে বললেন, ছোট আছে বলে এখন ওকে মারলি—ও বড় হোক, তখন মজা দেখাবে তোকে।

পুতুলের মা হেসে উঠেছিলেন।

—যা বলেছেন দিদি। বড হোক, তারপরে দুটিতে বিয়ে দিয়ে দিন। তখন আমার মেয়ে এর শোধ নিতে পারবে।

আমি বলেছিলুম, দ্যুৎ!

পুতুলের মা তেম্‌নি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেছিলেন: দ্যুৎ কেন? পছন্দ হল না?

আমি জবাব দিয়েছিলুম: পছন্দ করতে বয়ে গেছে। ওই তো পুঁচকে একটা ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে, আমি ওকে বিয়ে করলে তো।

মা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, হাঁ, সে একটা কথা বটে। একটু বড়োসড়ো বৌ না হলে আমার ছেলের তো চলবে না। সে এর মধ্যেই বৌ পছন্দ করে বসে আছে—জানেন না বুঝি?

—না তো। কাকে পছন্দ হল খোকনের?

—রামপিয়ারীকে। ভারী ভাব তার সঙ্গে। সেই তো জাম-টা কুল-টা এনে দেয় ওকে।

তারপর দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন।

রামপিয়ারী আমাদের বাড়ীর ঝি। মাথার চুল অর্ধেক শাদা। মুখের সামনের দিকে তিনটে দাঁত নেই তার।

—ধ্যেৎ!

আমি দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলুম ওখান থেকে।

কিন্তু আমার সব মনে আছে, একটি কথাও আমি ভুলিনি। আমার স্তব্ধ হয়ে যাওয়া আলোর জগতের ভেতর ওরাও যেন থমকে থেমে আছে। কিছু হারায়নি—একটা কথাও না। আর একটা স্মৃতিও মনে আসছে এই সঙ্গে। বিয়ের সময় দিদির যে ঘরে বাসর হয়েছিল, ওরা চলে যাবার পরে পাঁচ সাতদিন সে ঘরটা তালাবন্ধ হয়ে পড়ে ছিল। তারপর যখন সেই ঘরের দরজা খোলা হল, তখন সেখানেই আমি

দাঁড়িয়েছিলুম। সেই বাসর-রাত্রির গন্ধের ঝলক তেমনি করে আমার চোখে মুখে এসে আছড়ে পড়েছিল—সেই ফুল, সেন্ট, চন্দন আর ধূপের গন্ধের উচ্ছ্বাস।

কিছুই হারায়নি।

আমার স্মৃতির ঘরটারও কোনো দরজা নেই। তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে চিরকালের কালো অন্ধকার। একটা স্থির-স্থবির কানা দেওয়াল। তাই সেখানে যা সঞ্চিত হয়ে আছে তা চিরকালের মতোই জমা হয়ে রইল। তাকে আমার হারাবার ভয় নেই। তার একটি কণাকেও নয়।

সেদিনের সব কথা আমার মনে আছে, সব।

সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়।

যখন কুল খেতুম কিংবা একমনে বসে জামরুল চিবোতুম—তখন দেখতে পেতুম পুতুল ঠিক এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছোটখাটো দিব্যি দেখতে শুনতে মেয়েটা—কিন্তু কী যে লোভী! ভাগ না দিয়ে উপায় ছিল না।

একটা কুল দিয়ে বলতুম, পালা—

পালাত বটে কিন্তু ফিরে আসতে দেরী করত না। সে কুলটা সারা হলেই হাজিরা দিত আবার।

—আর দেব না। যা—

—না, দাও। ওই লালটা।

—হুঁ, ওইটে দেব বই কি তোমায়! মিষ্টি বড়ো কুল—সব শেষে খাব বলে রেখে দিয়েছি। আবার তোমার নজর গিয়ে ওটার ওপর পড়েছে!

—দাও না। নইলে কাঁদব কিন্তু।

—কাঁদ্—যত ইচ্ছে। আমি দিলে তো!

কান্নার ভয় দেখিয়ে কাজ না হলে পুতুল তখন অন্য রাস্তা ধরত।

—তোমাকে মস্ত একটা বাঘ এসে হালুম করে কামড়ে দেবে। দেখো তখন।

আমি নির্বিকার চিত্তে বলতুম: আসুক না কামড়াতে। আমিও কামড়ে দেব বাঘকে।

অগত্যা সন্ধি।

—আচ্ছা—তবে ওই হলদে ফুলটা আমায় দাও—

কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল ওই ছোট্ট মেয়েটা। সেই গড়াই নদীর স্রোত সরে গিয়েছিল কত দূরে—বাঁকের মুখে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই নীলকুঠিটা তলিয়ে গিয়েছিল কোন অন্ধকারে।

তবু পুতুল আবার ফিরে এল নতুন করে।

আজ ষোলো বছর পরে তার কথা শুনতে পাচ্ছি। এখন আর সে পুতুল নেই। ওইটুকু মেয়ের এখন যে একটা নাম আছে, কে জানত সে কথা। এখন সে রঞ্জা—রঞ্জা দাশগুপ্ত। ফিফ্‌থ ইয়ারের ছাত্রী।

আমার মনে আছে, বাবা আমাকে কবে যেন লুসি গ্রে-র কবিতা শুনিয়েছিলেন। সেও একটি ছোট মেয়ে—তুষার পড়বে, ঝড় আসবে জেনে ছোট একটি লণ্ঠন হাতে করে মাকে আনবার জন্য শহরের দিকে রওনা হয়েছিল। তারপর সেই ঝড় এল, তুষার ঝরল—কিন্তু ছোট মেয়েটিকে আর খুঁজে পেলো না কেউ। তার ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন অনেক দূর পর্যন্ত বাবা-মাকে পথ দেখালো, তারপর:

> "And then an open field they crossed:
> The marks were still the same;
> They tracked them on, nor ever lost;
> And to the bridge they came.
> They followed from the snowy bank
> Those footmarks one by one,
> Into the middle of the plank
> And further there were none—"

ছোট বেলায় এই কবিতাটা শুনতে শুনতে আমার দু-চোখ ভরে জল আসত। স্পষ্ট দেখতে পেতুম, ছোট মেয়েটি সেই ঝড় আর তুষার পাতের ভেতর দিয়ে একলা চলেছে পাহাড়ী পথ দিয়ে, হাওয়ায় উড়ছে তার চুল, হাতের লণ্ঠনটা নিবে গেছে—সে আর পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর কখন নদীর সাঁকোটার ওপর গিয়ে সে উঠল, এল একটা ঝড়ো হাওয়ার দমক; কাঠের ওপর থেকে তার পা পিছলে গেল, একবার শুধু ডাকল ঃ মা—মা—

আর কিছু নেই তারপর। শুধু সেই অন্ধকার হিমশীতল নদীটাই জানল তার খবর, আর তুষারের ওপর রাশি রাশি জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো জেগে রইল তার পায়ের ছাপ—কোথায় সে—কোথায় গেল?

আমার মনের ভেতরেও ওই রকম কয়েকটা ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন রয়েছে—সেই পুতুলের ছেলেবেলার দিনগুলি। তারপর ঝড় এল। সে ঝড়ে আমিই আর তাকে খুঁজে পাই না। আমারই চোখের সামনে দেখা দিল অন্ধকারের নদীটা—যার মাঝখান পর্যন্ত এসে সেই পদচিহ্ন চিরকালের মতো মিলিয়ে গেছে।

আজ এতদিন পরে সেই কালো স্রোতটার ভেতর থেকে কে উঠে এল? পাতাল যাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে কি রাজকন্যা সাজিয়ে ফিরিয়ে দিলে আবার? রঙ্গা!

দিদি এসেছিল কয়েকদিন আগে। গল্প করছিল মা-র সঙ্গে। আমার এই ঘরে বসেই।

অনেক কথা—অনেক বিবরণ। দিদির শ্বশুর-বাড়ীর কাছাকাছিই নাকি ওরা থাকে, বালীগঞ্জ গার্ডেনেস্-এ। পুতুলের বাপ এখন রিটায়ার করেছেন, তার দাদা চাকরি করে রাইটার্স বিল্ডিঙে। পুতুলের মাও খুব মোটা হয়ে গেছেন এখন। আর দারুণ পান খেতে ভালোবাসেন।

দু-একবার এমনি দেখা হয়েছে। দিদির মনে হয়েছে যেন 'চিনি-চিনি'—কিন্তু কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপরে একদিন পুতুলের মা-ই ওকে ডাকলেন।

—কিছু মনে কোরো না। তোমার নাম সমিতা নয়? ডাক নাম পরী?

ব্যাস-তখুনি আলাপ হয়ে গেল। সেই পুরোনো দিনগুলির কথা। কত গল্পগুজব।

তারপর মাসিমাই দিদিকে টেনে নিয়ে গেলেন ওঁদের বাড়ীতে। পুতুল ছোটবেলায় সুন্দর তো ছিলই—এখন আরো অনেক সুন্দর হয়েছে। খুব ভাল গান শিখেছে, 'দক্ষিণী'র নামকরা ছাত্রী। কিন্তু এখন মা ছাড়া কেউই আর ওকে পুতুল বলে ডাকে না—এমন কি ওর বাবাও নয়। এখন ও রঞ্জা দাশগুপ্ত।

—আমাদের সকলের কথা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন মাসিমা: দিদি বলছিল: জানো মা, শীগ্‌গিরই ওঁরা একদিন আসবেন এ বাড়ীতে।

আরো কী সব বলেছিল দিদি—তার সব আমি শুনতে পাইনি। চার বছরের পুতুল যে এখন একুশ বছরের রঞ্জা—এই কথাটাই আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলুম। খুব সুন্দর হয়েছে সে—কিন্তু কেমন সুন্দর? আমার চেনা আলোর জগতে একুশ বছরের কোনো সুন্দর মানুষকে আমি দেখিনি—দেখতে পাই না।

টুনটুনের বয়েস কত? আঠারোর বেশি নয়। ও ঘরে এলেই মনে হয় একটা ছোট্ট পাখি এল কোথা থেকে—যেমন করে আমাদের জানালায় এক একদিন ঝুঁটিওলা বুলবুলি এসে বসত। ওর গলার স্বর পাখির ডাকের মতো মনে হয়—ওর কাছে থাকাটুকু যেন একরাশ নরম পালক দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখে।

রঞ্জাও কি অনেকটা ওই রকম? এমনি শান্ত, এমনি স্নিগ্ধ, এমনি পাখির মতো তার গলার আওয়াজ?

জানি না। কোনোদিনই কি জানতে পারব?

[আবার লেখা বন্ধ করলুম। হাতটা দারুণ ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। কাগজের ওপর আঙুলগুলো বুলিয়ে নিলুম একবার—রাশি রাশি বিন্দুতে

আমার মনের কথাগুলো ফুটে উঠেছে সেখানে। এ লেখা রঞ্জাকে পড়তে দিলে কেমন হয়? তার চার-পাঁচ বছর বয়সের সেই সব দুষ্টুমির কাহিনী —তার সেই লোভের গল্প? এখনো কি সে তেমনি করে আমার কাছে এসে কুল চাইতে পারে, আর কুল না দিলে দেখাতে পারে সেই বাঘের ভয়?

কিন্তু এ লেখা তো রঞ্জা পড়তে পারবে না—তার চোখ আছে। অন্ধ ছাড়া অন্ধের লেখা কেউ বুঝতে পারে না—ব্রেলের এই বিন্দুগুলো তার কাছে অর্থহীন। কিন্তু শুধু কি এই বিন্দুগুলোই? আমি তো ষোলো বছরের ওপারে থেমে গেছি—রঞ্জার নয়, আমারই পায়ের চিহ্ন লুসির মতো থেমে দাঁড়িয়েছে একটা অন্ধকার হিমশীতল নদীর ধারে। আর রঞ্জার জীবনে আলোর পরে আলোর ঢেউ এসেছে, নদীর পরে নদী এসেছে; এ সব লেখা তার কাছে কী অর্থ আজ বয়ে আনবে?

লেখাটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিলুম।

রাত কত হল এখন? দশটা বাজল? সাড়ে দশটা? না—আরো বেশি? না—খুব বেশি নয়। ওই তো রাস্তার ওপারের কোন্ একটা বাড়ীতে রেডিয়ো বাজছে। আমি চকিত হয়ে উঠলুম। আশ্চর্য —এই রাত্রে আমার মনের কথাটা এমন করে কে জানল? কে জানল —আজ এই মুহূর্তে এই গানটাই একটা নেপথ্য-সঙ্গীতের মতো আমার প্রতিটি স্নায়ুতে বেজে চলেছিল?

'অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে—'

আলো তো নেই—একুশ বছরের রঞ্জাকে আমি দেখব কী করে? শুধু স্বরে, শুধুই পায়ের শব্দে? সেই চার বছরের মেয়েটি—কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে যার লাল রিবন বাঁধা? কুল কিংবা জামরুল খাওয়ার সময় যার লোভীর দৃষ্টি?

'তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে—'

ঠিক। সেদিনের সেই খেলা ঘরের পুতুলটা ভেঙে গেছে। কিন্তু

সে পুতুল তো আমিই। এখন পেছনের তুষারের ওপর নিজের ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন ছাড়া কিছুই আর দেখতে পাই না। রঞ্জা আজ একুশ বছরের বসন্তে রাজকন্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কুঁড়ি যেমন করে ফুল হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবেই সে ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে।

মাসিমার কথাটা ভেসে উঠছে স্মৃতির ওপর।

—যা বলেছেন দিদি। বড় হোক—তারপর দুটিতে বিয়ে দিয়ে দিন। তখন আমার মেয়ে এর শোধ নিতে পারবে।

আমার হাসি পাচ্ছে।

আচ্ছা, সেদিনের প্রস্তাবটা আজ যদি মা আবার নতুন করে তোলেন? যদি বলেন, দিদি, ছেলেবেলায় কিন্তু কথা হয়েছিল, এদের দুজনের বিয়ে দিয়ে—

ষোলো বছর আগেকার সেই হাল্‌কা একটা কথার টুকরো। নিতান্তই বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া।

আমি ছাড়া আর কেউ মনে রাখেনি—কারো মনে রাখবার মতোও নয়। এই ষোলো বছর ধরে কত সূর্য উঠেছে, বর্ষা পড়েছে, উল্কা ঝরেছে—গড়াই নদী দিয়ে কত জল এগিয়ে গেছে সাগরের দিকে। সেই স্রোতে আমি আর দিদি যে-সব কাগজের নৌকো ভাসিয়েছিলুম—তাদেরই মতো এই একটা কথার টুকরো কোথায় ডুবে গেছে, কবেকার জলের ধারায় মিশে গলে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেবল আমিই তাকে ধরে রেখেছি। দিদির সেই বাসর ঘরটার মতো স্মৃতির দরজাটা খুলে দিলেই কতদিনের হারানো গন্ধের উচ্ছ্বাস হয়ে আবার বুকের মধ্যে তা নতুন করে ছড়িয়ে যায়।

আমি আর রঞ্জা! এখন কে কোথায়!

আমি অন্ধ। অন্ধের স্কুলে লেখাপড়া শিখে বি. এ. টা পর্যন্ত পাস করেছি। বাবা আর কাকা মিলে এই ছোট বাড়ীটা তৈরী করেছিলেন কলকাতায়—তাই মাথা গোঁজবার জায়গাটুকু আছে। বড়দা দিল্লী থেকে মা-কে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায়। আর

আমি একেবারে নিশ্চিন্ত—নিজের ঘরে বসে বসে খেয়ালখুশি মতো এলোমেলো লিখে দিন কাটাই। রঞ্জা এখন অনেক দূরে—অনেকখানি আকাশ পেরিয়ে কোনো তারার জগতে।

রঞ্জা আমাকে বিয়ে করবে?

কোনো পাগলও এমন অসম্ভব স্বপ্ন দেখতে পারে না। রঞ্জা দূরে থাক—কোনো মেয়েই কি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে? নিতে চাইবে একটা অন্ধ—অক্ষম—নিরুপায়ের ভার?

গানটা কে গাইছে রেডিয়োতে? ভারী সুন্দর গলাটি কিন্তু। রঞ্জাই নয় তো? দিদি বলছিল, খুব ভালো গান শিখেছে সে।

'থাক তবে সেই কেবল খেলা,
হোক না এখন প্রাণের মেলা
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহিরে—'

না—আবার লেখা শুরু করি। আসলে আলো নেভার কাহিনীটাই লিখতে বসেছিলুম। সেই আকাশ-আলো-গড়াই নদীর ধারে কেমন করে আমার চোখ চিরদিনের মতো ডুবে গেল, সেইটেই বলতে চেয়েছিলুম। কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলছি বারবার। কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাই।

কিন্তু আর লেখা হল না। আজো মা চলে এসেছেন। সেই চেনা পায়ের আওয়াজ। সেই খুট করে আলো জ্বলে ওঠা।

—আজো আবার রাত জাগছিস বাবা?

—না মা, এই শুতে যাচ্ছি।

টেবিলের ওপর লেখাটা রাখলুম, এগিয়ে গেলুম বিছানার দিকে, শুয়ে পড়লুম ক্লান্ত মাথাটাকে বালিশে এলিয়ে দিয়ে। মা-র পদ্মের মতো হাতখানা টের পেলুম বুকের ওপর—চাদরটা টেনে দিচ্ছেন। ইচ্ছে করল, হাতখানা টেনে ধরে ছেলেবেলার মতো, বলি: মা তুমি যেয়ো না। আজ থাকো আমার কাছে। আমার ভয় করছে।

মা চলে গেলেন।

আমার পায়ের কাছের খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে। কেমন ভিজে ভিজে হাওয়া। হয়তো বৃষ্টি আসবে—হয়তো দক্ষিণের আকাশ ঘিরে মেঘ উঠছে—যেমন করে উঠে আসত গড়াই নদীর বাঁকের মুখে সেই নীলকুঠিটার ওপর দিয়ে।

সেই নীলকুঠি! বুকের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা ভয়ের তরঙ্গ দুলে উঠল। সেই কালো অন্ধকার ইঁদারাটা—যার ভেতর থেকে—না—আজ আর নীলকুঠির কথা নয়। এই রাতে সেই বিভীষিকাকে আমি জোর করে দূরে সরিয়ে দেব। এখন আমার চোখে একটা নরম শান্ত ঘুম ঘনিয়ে আসুক ধীরে ধীরে। সেই ঘুমের ভেতর দিয়ে আমি দেখতে চেষ্টা করব —আমার অন্ধ চোখ দুটোকে স্বপ্নের মধ্যে ফুটিয়ে তুলে দেখতে চাইব—কেমন করে সেদিনের একটা ছোট পুতুল একুশ বছরের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে রাজকন্যা হয়ে জন্ম নিল!]

॥ চার ॥

চা খেয়ে সকালে আবার লিখতে বসেছি। আবার কাগজের ওপর খুট খুট করে ফুটিয়ে তুলছি রাশি রাশি বিন্দুকে। অন্ধের কথা। যেমন বাজিয়ের হাত ছাড়া সেতারের তারে ঝঙ্কার ওঠে না, তেমনি অন্ধের আঙুল না হলে এ কথাগুলোর অর্থ ধরা দেবে না। এ লেখা টিনটুন পড়তে পারবে না—রঞ্জাও নয়।

মনে পড়ছে যখন ব্লাইণ্ড স্কুলে ভর্তি হই, তখন আমাকে নিয়ে কী সমস্যা ওঁদের।

আমি জন্মান্ধ নই। অন্ধকারের বন্ধ দেওয়ালের ভেতর তো আমি আসিনি। বই চিনি, হরফ চিনি, পৃথিবীর আলো—রঙ—সব কিছুর রহস্যই আমার জানা। আমার চোখের সেই চেনাকে ভুলিয়ে দিয়ে —অনুভবের মধ্যে আমার তৃতীয় দৃষ্টিটিকে ফুটিয়ে তুলতে ওঁদের অনেক কষ্ট হয়েছিল—অনেকদিন সময় লেগেছিল।

'অন্তরে আজ দেখব, যেথায় আলোক নাহিরে।' কী ভেবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তিনিই জানেন। চোখের আলো যার কখনো ছিল না, তার মনের চোখে তমসার সমুদ্রের ভেতর বিশ্ব অনুভূতির কালো পদ্মটি আপনা থেকেই ফুটে ওঠে—ধ্বনিতে, গন্ধে, স্পর্শে একে একে সেই নিশিপদ্মটি তার পাপড়িগুলোকে মেলে দিতে থাকে। কিন্তু গড়াই নদীর জলে যে সূর্যকে উঠতে দেখেছে, দেখেছে দুপুরের রোদে আকাশে মেঘের আসা-যাওয়া, সমস্ত পাতাগুলোকে একেবারে ঢেকে দিয়ে সারি সারি সোনা রঙের চাঁপা ফুটেছে যার চোখের সামনে, সজারুর কাঁটার শব্দে নির্জন পথে সন্ধ্যার পায়ে ঝমর ঝমর করে মল বাজলে যে কুলগাছের মাথায় মাথায় তারার ফুলকির মতো জোনাকি জ্বলতে দেখেছে—হঠাৎ আসা অন্ধকারে তার দৃষ্টি কি নতুন করে জাগতে চায়? দিনের শতপর্ণী যেখানে এখনো আলোর বৃন্তে স্থির হয়ে রয়েছে—সেখানে কি ফুটতে পারে নিশিপদ্ম—তামসী মধু দিয়ে ভরে নিতে পারে মর্মকোষ?

তাই আমাকে নিয়ে ওঁদের খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল।

ধীরে ধীরে সব সহজ হয়ে এল, ফুটে উঠল অন্ধকারের কমলটি। আলোর স্মৃতি যা কিছু ছিল সব এখন এই গোল-টেবিলটার মতো একটা ছোট বৃত্তে বাঁধা পড়েছে। বাকী সব ধ্বনিময়—গন্ধময়—স্পর্শময়।

আমি সেই বৃত্তের কথাই লিখছিলুম।

গড়াই নদীর বাঁকের মুখে নীলকুঠি। কতকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে ঝোপঝাড় আর কতগুলো গাছপালার আড়ালে। বড়ো বড়ো খালি ঘর—বাদুড়-চামচিকের আস্তানা, দরজার কবাট নেই—ঘরগুলো যেন হাঁ করে আছে। একদিকে খানিকটা ধ্বসে পড়েছে, সারা বাড়ীময় অজস্র ফাটল—অসংখ্য বট আর অশথের চারা। লোকজন কেউ যায় না ওদিকে—শুনেছি কখনো কখনো এক আধজন পাগল কিংবা ভিক্ষুক এসে দু-চারদিনের জন্যে বাসা বাঁধে।

নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেই ওই পোড়ো বাড়ীটা আমায় হাতছানি দিত। একটা অদ্ভুত আকর্ষণে টানতে থাকত।

কতবার বাবাকে বলেছি, বাবা—ওখানে বেড়াতে যাব।

বাবা বলতেন, না, ওই জংলা পোড়োবাড়ীতে যেতে নেই।

—ভূত আছে ?

বাবা বলতেন, ভূত-টুত বাজে কথা। বন-জঙ্গলে না যাওয়াই ভালো। বিছুটি আছে, কাঁটা বন আছে ; সাপ-খোপও থাকতে পারে।

কিন্তু ওই নিষেধটাই আমার মনকে আরো বেশি দুলিয়ে দিত। ভূতই যদি না থাকে, তবে কিসের ভয়—কাকে ভয় ! তা ছাড়া যতক্ষণ আলো আছে, দিন আছে—ততক্ষণ তো আমার কোনো ভাবনা নেই। শুধু নীলকুঠি কেন—গড়াই নদী পার হয়ে, তার বনঝাউ আর কাশফুলে ভরা সেই মস্ত চরটাকে ছাড়িয়ে—কতদূরে—কতদূরে আমি চলে যেতে পারি !

সেদিন ছুটির দুপুর। বাবা ঘুমুচ্ছিলেন। মা শোওয়ার ঘরে কী যেন সেলাই করছিলেন একমনে। আর দিদি গিয়েছিল রঞ্জাদের বাড়ীতে বেড়াতে। আমি বসে বসে একা একাই স্নেকল্যাডার খেলছিলুম।

তিনবার একশোর ঘরে পৌঁছুবার পর আর আমার ভালো লাগল না। আমি আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলুম। শীতের শেষ—গাছে গাছে রূপালি-সোনালি আমের মুকুল ভরে উঠেছে। নরম শান্ত রোদে মুকুলের গন্ধ। কোকিল ডাকছে এদিকে-ওদিকে—আমাদের চাঁপা গাছটায় দুটো দোয়েল এসে বসেছে।

বাড়ীর দক্ষিণ-দিক বেয়ে যে পায়ে চলার পথটা চলে গেছে রাখালদের পাড়ায়—আমি অন্যমনস্ক ভাবে সেইটে ধরে হাঁটতে শুরু করলুম। দু-ধারে ভাঁট ফুল ফুটেছে, হাওয়ায় উড়ছে শিমুলের তুলো, তাদের সঙ্গে উড়ছে নানা রঙের প্রজাপতি। কাঁচপোকা দেখছি এখানে-ওখানে—এদের ধরতে পারলে দিদি টিপ তৈরি করবার জন্যে একটা ছোট কাচের শিশিতে আটকে রেখে দেয়। ফুল, প্রজাপতি, পাখি আর কাঁচপোকা দেখতে দেখতে কতদূরে চলে গেছি—তারপর—তারপর চমক ভাঙলে দেখি, আমার বাঁ-দিকে গড়াই, আর সামনে সেই নীল কুঠি।

দিনের আলোয়—প্রথম বসন্তের রোদে, পুরোনো, আস্তর-খসা, ভেঙে-পড়া, ফাটল-লাগা বাড়ীটা। সামনে ছোট মাঠটা জুড়ে চোরকাঁটা আর ভাঁট ফুল। সাপ-খোপ কোথাও চোখে পড়ল না। দেখলুম কয়েকটা ছাগল চরছে—তিন চারটে খঞ্জন পাখি ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে কী যেন খুঁটে খাচ্ছে ঘাসের ভেতর। আর চারদিক কী নির্জন। শুধু বাতাসে ভাসছে শিমুল তুলো—উড়ে উড়ে ঘুরছে প্রজাপতি।

আমি নীলকুঠির দিকে এগোলুম। আর দেখতে পেলুম একটা পুরোনো মস্ত ইঁদারা।

ইঁদারাটার কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলুম।

প্রথমে কিছু দেখতে পাই না—শুধু অতল অথৈ অন্ধকার। মনে হল এ-ই যেন পাতালের পথ—এর ভেতর দিয়ে একবার নেমে পড়তে পারলেই বুঝি সোজা নাগকন্যার দেশে গিয়ে পৌঁছোনো যায়। এক মনে এমনি একটা কিছু ভাবছিলুম—হঠাৎ মনে হল, অন্ধকারের ভেতরে —আমার মাথা থেকে সামান্য নীচেই—কেমন শোঁ-শোঁ ফোঁস-ফোঁস করে আওয়াজ উঠছে।

তারপরেই আমি দেখলুম।

কী দেখলুম? জানি না। শুধু সেই অন্ধকারের ভেতরে দুটো আগুনের টুকরোর মতো চোখ। কার চোখ—কিসের চোখ আমি জানি না। কেবল মনে পড়ে—সে দুটো জ্বলছিল—অসহ্য বিষাক্ত হিংসায় জ্বলছিল।

আকার নেই—কেবল সেই দুটো হিংস্র বিষাক্ত চোখের নিষ্ঠুর ক্রুরতা দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালুম আমি। জানলুম—আকাশভরা আলোর ভেতরেও কোথাও কোথাও লুকিয়ে থাকে নির্মম ভয়ঙ্কর অন্ধকার—আলোর মানুষ তার ভেতরে অনধিকার চর্চা করলে তার জন্যে কঠিন মূল্য দিতে হয় তাকে।

বাড়ীতে পালিয়ে এলুম। কাউকে কিছু বলতে পারলুম না—ভয়ে, লজ্জায়। সারা রাত ঘুম এল না—খালি মনে হতে লাগল এক চাপ

অন্ধকারের ভেতর থেকে দুটো আগ্নেয় হিংস্র চোখ উঠে এসে আমার বুকের মাঝখানে দুটো কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে।

অনধিকার প্রবেশের দণ্ড এল পরের দিন।

সকাল থেকেই কেমন যেন লাগছিল শরীরের ভেতর। আমি চুপচাপ বাইরের রোদে এসে বসেছিলুম।

মা বললেন, তখন থেকে অমনভাবে রোদে বসে কেন রে?

বললুম, ভারী শীত করছে মা!

মা এসে হাত রাখলেন কপালে। সেই ভরা পদ্মের মতো নরম, ঠাণ্ডা হাতখানা।

—এ কি! জ্বর আসছে যে!

—না, জ্বর আসবে না।—আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাতে চাইলুম।

—আসবে না কিরে, এসেই তো গেছে। ওঠ হতভাগা, শীগ্‌গির ওঠ—

জোর করে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

কী যন্ত্রণা শরীরে—কী অসহ্য যন্ত্রণা! জ্বর বাড়তে লাগল, ঘোর নেমে এল চোখে। আর শরীরের সেই যন্ত্রণায় সেই জ্বরের তীব্র নেশায় —আমি অনুভব করতে লাগলুম, জানালার বাইরে কাঁটালী চাঁপার গাছটায় সোনা রঙের অসংখ্য ফুল ফুটেছে—দূরের গরম বাতাসে তার গন্ধ আমার মুখে চোখে এসে আছড়ে পড়ছে।

চাঁপার গন্ধের সুর আবার কেটে যায় পরক্ষণেই। হঠাৎ চমকে উঠি। নীলকুঠির সেই ইঁদারার ভেতরে, সেই কালো পাতালের অন্ধকার পথটায় দুটো চোখ আমার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে, আওয়াজ তুলছে, শোঁ-শোঁ ফোঁস্-ফোঁস্—

থেকে থেকে চিৎকার করে উঠি: মা—ও কিসের চোখ? কার চোখ?

চাঁপার গন্ধে, শরীরের যন্ত্রণায়—সেই দুটো দুর্বোধ চোখের দুর্বোধ্য আতঙ্কে কখন আমার রাত্রিদিন একাকার হয়ে গেল। একটা সুদীর্ঘ,

স্থায়ী কণ্টক-শয্যার মতো অসীম ভয়ের কালো রাত আমায় ঘিরে রইল কতদিন। তারপর একদিন যন্ত্রণার পালা ফুরোলো, মা হাতে ধরে আমায় বিছানায় তুলে বসালেন।

—মা মাগো! ঘরে কত রাত। একটা আলোও যে তুমি জ্বালোনি।

মা জবাব দিলেন না।

—মা, ওই তো বাইরে পাখি ডাকছে, চাঁপার গন্ধ পাচ্ছি। ওই যে পুতুলের গলা শুনছি—সে তো কখনো রাতের-বেলায় আসে না, আসে না আমাদের বাড়ীতে।

আমার হাতে মা-র হাতের মুঠোটা শক্ত হয়ে গেল।

—মা, তবে তো এ দিন। আমি তা হলে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? কেন পাচ্ছি না?

এবারেও মা জবাব দিলেন না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন কেবল।

সব জানলুম ক্রমে ক্রমে। আমার বসন্ত হয়েছিল। দুটো চোখের অর্ঘ্য নিয়ে এ যাত্রা সে আমায় মুক্তি দিয়েছে। নীলকুঠির অতল-ছোঁয়া ইঁদারার ভেতরে অন্ধকারের দূত হয়ে সে দুটো চোখ উঠে এসেছিল, তারাই আমার আলো কেড়ে নিয়ে আপন করে নিলে।

—মা মাগো! তুমি কোথায়? তোমার হাতখানা কই? একবার রাখো আমার বুকের ওপর।

আমার অতল-সমুদ্রে প্রথম কুঁড়িটি জেগে উঠল। শুধু স্পর্শ, শুধু শব্দ, কেবল অনুভব।

নিজের মুখে নিজেই হাত বুলিয়েছি কতবার। বসন্তের ক্ষত চিহ্নগুলো এখনো আছে এখানে-ওখানে; ব্রেলের বিন্দুর মতো ওদের আমি আঙুলের ছোঁয়ায় পরীক্ষা করি—একটা দুর্বোধ্য লিপির মতো পাঠোদ্ধার করতে চাই। ওদেরও কি কোনো মানে আছে—কেউ কি কিছু সাজিয়ে সাজিয়ে লিখে দিয়েছে ওদের?

আমার ভাগ্যলেখা ? আমার অদৃষ্টের সংকেতলিপি ?

হাসি পায়। অদৃষ্টকে আমি বিশ্বাস করি না।

—সোনা দা !

ঘরে হাল্‌কা পায়ের শব্দ। একটা ছোট পাখি যেন টিপ টিপ করে হেঁটে এল। টুনটুন।

—কি করছ সোনা দা ?

—কিছু না—কিছু না। একটু লিখছিলুম।

—কবিতা ?—টুনটুনের স্বরে আগ্রহ : পড়ো না।

—না, কবিতা নয়। ['পাণ্ডু গগনে সখি সন্ধ্যাতারা'—নিজের লেখা সেই কবিতাটা ওকে শোনানো যায় ? না—যায় না। ও আমার ছোট বোন, আর মায়ের মতো ওর মন।]—আমি একটু চুপ করে থেকে বললুম, এলোমেলো লেখা—কোনো মানে নেই।

— ও।

টুনটুনেরও কী যেন একটা ভালো নাম আছে রঞ্জার মতো ? হাঁ, মনে পড়েছে। এনাক্ষী। হরিণ-নয়না। হরিণের চোখ আমি কখনো দেখেনি, সংস্কৃত কবিতায় তার স্তুতি শুনেছি অনেক। কেমন সে চোখ ? খুব সুন্দর, খুব গভীর, খুব কালো ? না, না কালো নয়, অনেক বড়ো একটা শরতের আকাশের মতো নিবিড় নীল ? আর সেই নীলের ওপর কি সন্ধ্যা-সকালের সব রঙ—রামধনুর সমস্ত মায়া ধরা পড়ে ?

টুনটুনের নাম এনাক্ষী। হরিণের মতো চোখ। আমি কখনো হরিণের চোখ দেখিনি—টুনটুনের চোখও কোনোদিন দেখতে পাবো না।

আবার ডাকল : সোনা দা !

—কিরে ?

—রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনবে ?

ও গান গাইতে পারে না, মধ্যে মধ্যে মিষ্টি হাতে সেতার বাজায়।।

বর্ষায় ওর আঙুলে নট-মল্লার নাচে, সন্ধ্যা বেহাগের সুরে ভরে ওঠে। শুনেছি ছবিও আঁকে, কিন্তু সে তো আমার সীমার বাইরে। আবৃত্তির গলাটিও ভারী সুন্দর ওর—নানা জায়গায় প্রাইজ পেয়েছে।

কাকার মতো বৈষয়িক এ্যাডভোকেটের মেয়ে হয়ে কেন জন্মালো টুনটুন? কেন ও আমার আপন বোন হল না?

কিন্তু চিন্তার বিন্দু সাজানোর চাইতে এই মুহূর্তে ওর কবিতা শোনাই আমার ভালো মনে হল। তা ছাড়া যা লিখতে চাইছি, তা কিছুতেই ঠিক মতো গুছিয়ে তুলতে পারছি না—কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ওকে বললুম, শোনা।

একটা ছোট মোড়া টেনে নিয়ে ও বসল—আমি টের পেলুম। ওর চুলের গন্ধ ভেসে এল হাওয়ায়।

—কী পড়ব সোনা দা?

একবার ইচ্ছে হল বলি, 'সুরদাসের প্রার্থনা।' কিন্তু ও কথাটা কি রঞ্জাকেই বলা যায় আজ? আমার সেই ছেলেবেলার পুতুল কোথায় হারিয়ে গেছে, কী দাবী আছে আমার রঞ্জা দাশগুপ্তের ওপর?

টুনটুনকে বললুম, পড়—তোর যা খুশি।

টুনটুন বইয়ের পাতা উল্‌টে চলল। আমি কান পেতে রইলুম। প্রত্যেকটা পাতার উল্‌টে যাওয়া বুঝতে পারছি। একখানা ছবি চলে গেলে, তারও আওয়াজ উঠল টুনটুনের আঙুলে। তারপর একটুখানি গলাটা পরিষ্কার করে নিলে, সুরেলা মিঠে আওয়াজে সমস্ত ঘরটা যেন ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে উঠল।

"বোলো, তারে বোলো
এতদিনে তারে দেখা হোলো
তখন বর্ষণ শেষে
ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুলমোরের থোলো

বনের মন্দির মাঝে
তরুর তম্বুরা বাজে
অনন্তের ওঠে স্তব গান,
চক্ষে জল বহে যায়—"

টুনটুনের গলার স্বরে কবিতার শান্ত গভীর মহিমায় আমার মনের চোখও বুজে আসতে চাইল। এ কবিতা কেমন করে লিখতে পারে মানুষ! এ কী দেখা—কী আশ্চর্য দেখা! বাইরের চোখ দিয়ে কি এমন করে দেখা যায়? মনের গভীরে তলিয়ে না গেলে, পৃথিবীর সব শব্দ নিরালোক নৈঃশব্দ্যের নিবিড়ে না পৌঁছুলে এমন করে কি তম্বুরা বেজে ওঠে?

টুনটুন পড়ে চলেছে। অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে মগ্ন হয়ে যাচ্ছি আমি।

"বোলো তারে আজ,—
অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।"

—ভালো লাগল সোনা দা?

—ভালো লাগল।

—আরো পড়ি ছুটো একটা।

—তুই যতক্ষণ খুসি পড়। আমার ভালো লাগা কিছুতেই ফুরোবে না, দেখে নিস।

টুনটুন পাতা উল্‌টাতে লাগল আবার। আর আমি ভেবে চললুম, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তো সহজেই বলে যেতে পেরেছেন। কিন্তু আমি কাকে বলব? কে শুনবে আমার পূর্ণিমার কথা?

টুনটুন আরো কয়েকটা কবিতা পড়ল একের পর এক। কিছু শুনছি—অনেকটা শুনতে পাচ্ছি না। সেই প্রথম কবিতাটাই গুনগুন করে চলেছে কানের ভিতরে। কত রাত্রির কত চৈত্র মাসের 'প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাস' অনুভব করছি আমি। বুকের মধ্যে তম্বুরা বেজে চলেছে একটানা। 'অনন্তের ওঠে স্তব গান—'

—সোনা দা?

আমার চমক ভাঙল।—অ্যাঁ?

—আজকে এখন থাক। কেমন?

—আচ্ছা, কাল শোনাবি আবার।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। টুনটুনের মনের ভিতরও কবিতার গুঞ্জন উঠেছে নিশ্চয়। ও-ও কি কিছু ভাবছে? কিন্তু কী ভাবছে? দু একবার খসখস করে আওয়াজ উঠল ওর শাড়ীতে, হাতের চুড়িও টিনটিন করে উঠল। কয়েক বছর আগে মা-র হাতেও অমনি চুড়ির আওয়াজ শুনতে পেতুম। এখন আর পাই না। মা-র হাত নিরাভরণ।

টুনটুন বললে, আসছে শনিবার কিন্তু আমাদের সোস্যাল সোনা দা।

—সে কিরে! এর মধ্যে সব তৈরী হয়ে গেল? তা তোদের নাটক?

—সেই যে—মুক্তধারা?

আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম। লেখা না-লেখায়, অলস ভাবনায়, ঘুমে স্বপ্নে দিনগুলো আমার কী ভাবে কাটে। আমার সময়ের কোনো হিসেব নেই। একটা দিনের ভেতরে কখন তিনটে দিন আসে—

একটা রাত কখন চারটে রাতকে পার করে দেয়। এই তো যেন সেদিন এসে ও আমাকে 'অরূপ-রতন' শুনিয়ে গেল। এর মধ্যে ক'বার সূর্য উঠল—ক'বার ডুবল? কিছুই আমি টের পাইনি।

—তুইও তো পার্ট করবি, না রে টুনটুন?

—বাঃ, তুমি সব ভুলে গেলে সোনা দা? আমি হচ্ছি হিরো—অভিজিৎ। মনে নেই তোমার?

—ঠিক মনে পড়েছে বই কি।—আমি লজ্জিত হলুম: কিন্তু এত ছোট্ট, এত রোগা অভিজিৎ? তুই কি বিভূতির যন্ত্রকে ভেঙে দিতে পারিস? তোকে মানাবেই বা কেন?

টুনটুন হাসল। একটা জলের ঢেউ যেন ভেঙে পড়ল কোথাও।

—সে হয়ে যাবে একরকম। যাবে তুমি দেখতে?

—দেখতে নয়।

একটু লজ্জা পেলো টুনটুন, আমি জানি ব্যথাও পেলো। এই ব্যথাটুকু ওকে দিতে আমার ভালো লাগে, যেমন ভালো লাগে, কখনো কখনো মা-র-দু-ফোঁটা চোখের জল আমার মুখের ওপর ঝরে পড়লে।

—তুমি শুনবে সোনা দা!—স্নিগ্ধস্বরে টুনটুন বললে, শুনে বলবে কেমন হল।

—কিন্তু না দেখলে কি বলা যায় রে?

টুনটুন আবার চুপ করল। আমি ওর চোখ দেখতে পাচ্ছি না—হরিণের মতো, আকাশের নীলের মতো চোখ। তবু বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তে সেই চোখের কোণা দুটো ওর জলে ভরে উঠেছে।

তারপর জোর করেই হেসে উঠল। সহজ করে নিতে চাইল সব।

—আমাদের সবাইকেই যে কেমন মানাবে সে তো ভালোই বুঝতে পারছ তুমি। কাজেই সে দৃশ্য দেখার চাইতে শোনাই ভালো হবে। সত্যি, যাবে তো তুমি?

আমি হাসলুম এবার। টুনটুনকে বুঝতে আমার বাকী নেই।

সেই পুরোনো কথাটাই। আমার এই একলা বসে থাকা, নিরালায়, এই ঘরের মধ্যে মেঘের ওপর মেঘের মতো ভাবনার ভার জমিয়ে তোলা, এইটে থেকেই ও আমায় মুক্তি দিতে চায়। বার বার নিয়ে যেতে চায় স্বাভাবিক সাধারণ জীবনের মাঝখানে, মনে করিয়ে দিতে চায়, সকলের ভেতরে আমিও একজন। বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে আমার এই তামস নির্বাসন ও সইতে পারে না।

আমার ওপরে ওর আশ্চর্য মমতা। সেইজন্যেই তো ওকে ছোট মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। টুনটুনেরও একদিন বিয়ে হবে—কেউ ওকে নিয়ে চলে যাবে, এটা ভাবতে আমার ভালো লাগে না? মা-র সঙ্গে আর একটি ছোট্ট মাকে পেয়েছিলুম, তার ফাঁকা জায়গা আমি ভরে নেব কী দিয়ে?

টুনটুন বললে, তা ছাড়া ভালো গানও কিন্তু আছে সোনা দা।

—তাই নাকি? কে গাইবে?

—কলেজের মেয়েরা। আর—

—আর কে?

—আর আমাদের একজন এক্স্-স্টুডেন্টও গাইবে সেদিনকার ফাংশনে। রঞ্জা দাশগুপ্ত। চমৎকার গায় সোনা দা। রেকর্ডও বেরিয়েছে একখানা। বেশ নাম করেছে।

রঞ্জা দাশগুপ্ত!

আমার বুকের ভেতরটা এমন করে দুলে উঠল যে মনে হল বাইরে থেকেও তার তরঙ্গটা দেখতে পাবে টুনটুন। বাংলাদেশে এই নামটা কি এতই সাধারণ—এখনকার মেয়েরা কি এই নামটি ছাড়া কিছুই খুঁজে পায় না আর? কিংবা তা যদি না হয় তা হলে আমার সামনের গোল টেবিলটার মতো পৃথিবীটা কি এতই ছোট হয়ে গেছে যে হাত বাড়ালেই আমি তার সম্পূর্ণটা পেয়ে যেতে পারি? আমার পুতুল কি আমারই আলোর সীমার ভেতরে স্থির হয়ে রয়েছে—তাকে ছাড়িয়ে এখনো সে চলে যেতে পারেনি—এই দীর্ঘ ষোলো সতেরো বছরেও নয়?

—যাবে তো সোনা দা ?

আমাকে খুশি করতে চায়। শামুকের মতো নিজের সত্তাটাকে গুটিয়ে নিয়ে বসে আছি—আমাকে নিয়ে আসতে চায় চারদিকের সজাগ চঞ্চল প্রাণস্পর্শের ভেতর; কিন্তু হঠাৎ রঞ্জার কথাটা কেন বলল ও ? ওকি কিছু বুঝতে পেরেছে ? কিছু কি ও জানে ?

কিন্তু কী-ই বা জানতে পারে ?

সেই চার বছরের পুতুল। মার সেই এক টুকরো ভাসিয়ে দেওয়া কথা। তাঁর সইয়ের সেই একটুখানি লঘু কৌতুক। হাওয়ায় উড়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঝরিয়ে দেওয়া কোন পাখির একটা ছোট পালক।

না—তার কথা কারো মনে নেই। আর টুনটুন তখন তো একটি প্রাণের কণা হয়ে দুলছিল ভোরের শিশিরে, নতুন পাতায়, দোয়েলের গানে, ধানের শিসে। ওর শরীর তখনও ওর স্বপ্নের বাইরে। ও জানে না—কেউ জানে না। কেবল আমিই তাকে ধরে রেখেছি নিজের স্মৃতির বৃত্তের ভেতর। আমার কৃপণ আলোর কৃপণ সঞ্চয়।

—কী ভাবছ সোনা দা ? যাবে না ?

যেন এক যুগ পরে আবার জিজ্ঞেস করল টুনটুন।

আমি আবার নিজেকে ফিরিয়ে আনলুম এই ঘরে, টুনটুনের গলার শব্দে।

বললুম, তুই তো চলে যাবি সেই কখন। তোদের স্টেজ রিহার্সাল আছে, মেক-আপ আছে। আমি কেমন করে যাব তোর সঙ্গে ? ফাঁকা হলে আমায় বসিয়ে রাখবি বুঝি ?

টুনটুন হাসল : বাবাও তো যাবেন। মা-জ্যেঠিমাও যেতে পারেন। তুমিও যাবে তাঁদের সঙ্গে। অভিনয় শুনবে—গান শুনবে। কেমন—রাজী তো ?

—রাজী।

—লক্ষ্মী ছেলে !

আমার কপালে একটা ছোট টোকা দিয়ে আদর করল টুনটুন, তারপর

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটি পাখির পা টিপটিপ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওকে আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু তবু দেখতে পাই। ছেলেবেলায় আমাদের বাগানে সেই যে রজনীগন্ধা ফুটত, ও তাদেরই একটি। অভিজিতের ভূমিকাতে কি ওকে মানায়? সেই যে একটি মানুষ—যার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের নাটকে কোথাও নেই—যাকে অভিজিত কখনো দেখেনি অথচ তার আসনের সামনে প্রত্যেক দিন যে করুণ প্রণামের সঙ্গে একটি শ্বেত-পদ্ম রেখে যায়—সেই না-দেখা নিঃশব্দচারিণীর সঙ্গেই তো ওর সত্যিকারের মিল।

টুনটুন।

আমার ছোট্ট বোন—আমার ছোট্ট মা।

॥ পাঁচ ॥

কলকাতার অন্ধ-নিকেতনের দিনগুলো ভেসে আসছে আজ। এক পৃথিবী ছাড়িয়ে আর এক পৃথিবীর দরজা যেখানে আমার খুলে গিয়েছিল, তার কথাই ভাবছি।

ছোট লাঠিটা হাতে করে চলেছি। চোখ না থাকার অভাব এখন আর মনেও পড়ে না। সব চেনা—সব অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখন। আমার ডানদিকে ফুলের সারি। বিলিতী সিজন ফ্লাওয়ারের উৎসব পড়ে গেছে এখন। বড়ো বড়ো ডালিয়া ফুটেছে, জিরেনিয়াম, লার্কস্পার, প্যান্‌সি। আরো যে কত আছে তাদের নাম জানি না। কোনদিন দেখিনি ওদের—আমাদের গড়াই নদীর ধারের সেই সরকারী বাসায় তখনো ওদের আনাগোনা ঘটেনি। আমি রঙ দিয়ে, রূপ দিয়ে ওদের জানি না, কিন্তু হাত বুলিয়ে সকলকে চিনতে পারি। আমার চারদিকে মৌমাছিদের আনাগোনা টের পাচ্ছি—এমন কি বাতাসে যে মৃদুতম তরঙ্গ উঠছে প্রজাপতির পাখায়—তাও আমার চেতনাকে এড়িয়ে যাচ্ছে

না। এমন কি যদি ঘাসের মধ্যে কান পেতে থাকি, তাহলে পোকাদের নিঃশব্দ কথালাপও আমি শুনতে পাব।

বসন্ত!

এম্‌নি এক বসন্তই তার রঙের দরবার থেকে আমায় নির্বাসন দিয়েছিল, কিন্তু সে কথা আর মনে পড়ছে না। কেবল কানে বাজছে, এমনি সব দিনগুলোতেই দিদি যেন লুকিয়ে লুকিয়ে গান করত: 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে, আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।' তখন নতুন সাবডেপুটি দিব্যেন্দু দা ঘন ঘন আসা-যাওয়া করত আমাদের বাড়ীতে, রোজ বিকেলে আমাদের বাড়ীর সামনে ক্রিং ক্রিং করে তার সাইকেলের আওয়াজ উঠত।

আর মা খুশি হয়ে বলতেন, এস বাবা দিব্যেন্দু, এসো। ওরে পরী কোথায় গেলি? দিব্যেন্দু এসেছে যে—ওকে চা করে দে একটুখানি।

চা করতে করতে দিদি চাপা গলায় গাইত: 'এলো ওই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে—'

এখন বুঝতে পারি, সে গানের অন্য অর্থ ছিল। তিনমাস পরেই আমার জামাইবাবু হল দিব্যেন্দু দা।

লাঠিটা হাতে করে চলেছি তো চলেইছি। বসন্তের রোদ মুখে পড়েছে, একটু একটু জ্বালা করছে কপালে, হাওয়া খেলে যাচ্ছে আমার চুলে। আমিও নিজের মনেই গুনগুন করতে লাগলুম।

'আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে—'

কে যেন হেসে উঠল ডানদিকে। লজ্জা পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম।

ওপাশে পুকুর। বাতাসে জলের ছলোছলো শুনতে পাচ্ছিলুম মধ্যে মধ্যে, টুপটাপ করে মাছ লাফাবার আওয়াজ আসছিল। আমি প্রায়ই ভেবেছি, আমাদের এই পুকুরের ধারেও কখনো কখনো বক এসে বসে কিনা—দিনের আলো ডুবে এলে তার রঙ পাখায় লেগে কোন দূর

জগতে ওরা উড়ে যায় কিনা। কিন্তু লজ্জায় কাউকে কোনোদিন সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারি নি আমি।

আবার এক ঝলক হাসি উঠল পুকুরের দিক থেকে। জলের নয়— মানুষেরই। বুঝলুম ঘাটলার কাছাকাছি এসে পড়েছি। আর হাসিটা যেন চন্দ্রা দির বলে মনে হল।

—তোমার গানের গলাটি তো বেশ মিষ্টি!

চন্দ্রা দিই বটে। হেসে বললুম, ঠাট্টা করছো?

—না, ঠাট্টা নয়। তুমি গান শিখলেই পারো!

—গান আমার শুনতেই ভালো লাগে। শোনাতে নয়।

ঘাটলার ওপর ঠক ঠক করে লাঠির আওয়াজ শুনতে পেলুম। চন্দ্রা দি বোধ হয় এতক্ষণ ওখানে একা চুপচাপ বসেছিল, আমার সাড়া পেয়ে এইবারে কাছে উঠে এল।

—কিন্তু শোনাবার যোগ্যতাও তোমার আছে দেখছি। এতদিন জানতুম না। এসো আমার ক্লাসে—তালিম দেব।

—দু-একজন শ্রোতা থাকা ভালো চন্দ্রা দি। সবাই যদি গাইয়ে হয়—শুনবে কে?

—তা বটে, কথায় তোমার সঙ্গে পারা যাবে না। চলেছ কোথায়?

—কোথাও না। ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—চলো, আমিও যাই তোমার সঙ্গে। একা একা বসে থাকতে আমারও ভালো লাগছে না।

দু'জনে কয়েক পা এগোলুম পাশাপাশি। তারপরে বললুম, পুকুরঘাটে অমন একা একা বসে থাকা ভালো নয় চন্দ্রা দি। শুনেছি অনেক জল। যদি পা পিছলে পড়ে যাও—

—ডুবে মরব, এই তো? তা হলে তো বেঁচে যাই হিরণ। আত্মহত্যা করবার সাহস তো নেই—অথচ কেন যে বাঁচতে চাই, তাও জানি না। মৃত্যু যদি এমন করে আসে, তবে তো সে আমার মুক্তি।

—ছি ছি, কী যে বলো।

চন্দ্রা দি হাসল মনে হল, সে হাসির আওয়াজ শুনতে পেলুম না।

আমার চাইতে চন্দ্রা দি বয়েসে বড়ো। কত বড়ো ঠিক বলতে পারব না—হয়তো আট দশ বছরের, হয়তো কম, হয়তো বেশি। কিন্তু বয়েসের কথা ভাবি না। সবাই চন্দ্রা দি বলে ডাকে, আমিও ডাকি। দিদির চাইতেও ভালো গাইতে পারেন (রঞ্জার চেয়েও ভালো কিনা জানি না—তার গান এখনো শুনিনি)—আমাদের এখানে তিনিই গান শেখান। খুব ভালোবাসেন মীরার ভজন: 'মেরী গিরিধারী গোপাল, দুসর ন কোই।' আর জানেন চমৎকার বুনুনির কাজ। আমাদের স্টল থেকে ওঁর হাতের কাজ খুব বিক্রী হয়, মেডেলও পেয়েছেন কয়েকবার। তাদের দুটো সোনার। চন্দ্রা দি হাত বুলিয়ে বলেছিল, সবই তো এক রকম। সোনারূপোর তফাত কী—বলতে পারো ?

পারি। কিন্তু বলিনি। রঙ যে কখনো দেখেনি, রঙের তফাত সে কোনোদিন বুঝবে না।

—তোমার পরীক্ষার পড়া কতদূর ? চন্দ্রা দি হঠাৎ জানতে চাইল।

আমি আই. এ.-র জন্যে তৈরী হচ্ছিলুম। আমাদের প্রিন্সিপাল ডবল এম. এ. তিনি খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন আমাকে। বললুম, চলছে একরকম। পাস করব।

—আমারও পড়বার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল না।—চন্দ্রা দির নিঃশ্বাস পড়ল।

—পড়লে না কেন ?

—যে কারণে তুমি গান শিখলে না—চন্দ্রা দি হাসল: আরে সবাই যদি লেখাপড়া শিখে ফেলে, তা হলে দুনিয়ায় মুক্‌খু কোথায় পাওয়া যাবে বলো দিকি ?

এ কথার জবাব ছিল। কিন্তু আমি কিছু বললুম না। চন্দ্রা দির কাছে এলেই মনটা কেমন ভারী হয়ে উঠতে থাকে। কথা নিয়ে খেলা করতে তখন ভালো লাগে না।

দুজনে এগিয়ে চললুম চুপচাপ। বাঁ দিকে সীজন ফ্লাওয়ারের দল—

হাওয়ায় তাদের পাতা কাঁপছে, পাপড়ি দুলছে। প্রজাপতি আর মৌমাছিদের ডানার আওয়াজ উঠছে। পাশের পুকুরে কলধ্বনি তুলছে জল। আমার গড়াই নদীর কথা মনে এল। সেই লাল কালো নদীর রঙ—চরের ওপর দিয়ে পোড়া মাটির পুতুলের মতো ছোট ছোট মানুষগুলো বাঁক কাঁধে নিয়ে কোথায় কোন দূরের গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। বড়ো বড়ো মহাজনী নৌকো থেকে জলের মধ্যে নুয়ে পড়ে পেতলের থালা ধুয়ে নিচ্ছে হিন্দুস্থানী মাল্লারা, সার-দেওয়া বকেরা উঠব-উঠব করছে তখন, দিদি হাততালি দিয়ে দিয়ে নেচে নেচে বলছে: বক মামা, বক মামা, পান দিয়ে যা—

চন্দ্রা দি অন্যমনস্কভাবে ওই গানেরই সুর টেনে চলেছে তখন।

'আলোতে কোন্ লগনে, মাধবী জাগল বনে, এলো ওই ফুল জাগানোর—'

দিদি—দিব্যেন্দু দা।

না ওরা নয়। আমি চন্দ্রা দির কথাই ভাবছিলুম।

জন্মান্ধ। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। বাবার অনেক টাকা ছিল ওঁর, সেই টাকার জোরে মনের মতো একটি সুপাত্রও কিনতে পেরেছিলেন। তখন চন্দ্রা দি আর কতো বড়ো? ষোলো-সতেরোর বেশি নয় ওঁর বয়েস।

টাকা দিয়ে পাত্র কেনা যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি যে আর কিছুই করা যায় না—চন্দ্রা দির বাবা নামকরা কন্ট্রাক্টার হয়েও সে কথা বুঝতে পারেননি। মনের মতো নতুন বাড়ী তৈরী করে তিনি মেয়ে-জামাইকে দান করেছিলেন, বোঝেন নি, বাইরের ঘর দিয়েই মনের ঘর বাঁধা যায় না।

চন্দ্রা দির ঘরও বাঁধা হল না।

স্বামী টাকার জন্যেই বিয়ে করেছিল। একদিনের জন্যে ভালো-বাসেনি, শ্রদ্ধা করেনি, মর্যাদা দেয়নি। যেন পরম অনুগ্রহ করেছে, এমনিভাবে বলত: আমি না হলে কী গতি হত তোমার?

তা-ও সইত। স্বামী সেখানেই থামল না।

অন্ধ যে চক্ষুষ্মানের চাইতে অনেক বেশি দেখতে পায়, তার শরীরে প্রতিটি শিরাস্নায়ু যে সাধারণ সহজ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ, চন্দ্রা দির স্বামী তা ভাবতেও পারেনি। তাই চরিত্রহীন লোকটি স্বচ্ছন্দে একাধিক মেয়ে ঘরে এনে তাদের সঙ্গে প্রেম করতেন—তারা আদৌ ভদ্রঘরের কিনা তাতেও সন্দেহ ছিল। স্বামী ভাবতেন, অন্ধ তার নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু চন্দ্রা দির কিছুই অজানা ছিল না।

একদিন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। মদের সঙ্গে শুরু হল কদর্যতম ইতরামি, যা ভদ্র-পাড়ায় কল্পনা করা যায় না।

চন্দ্রা দি নিজেকে নিয়ে চুপ করেই থাকত এ পর্যন্ত। কিন্তু সেদিন সে আর পারল না। স্বামীর ব্যবহারের সে প্রতিবাদ করল।

ঃ ছি ছি, লজ্জাও করে না! তুমি না লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলে?

অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল জানোয়ার স্বামী। গায়ে হাত তুলল। কপাল কেটে নামল রক্তের ধারা। চন্দ্রা দি ফিরে এল মা-বাপের কাছে।

বাপ বলেছিলেন, মামলা করব। জেলে পাঠাবো রাস্কেলকে।

চন্দ্রা দি বলেছিল ঃ না।

ঃ না কেন? ওর শিক্ষা হওয়া দরকার।

ঃ শিক্ষা দিয়ে কী লাভ বাবা? আমি তো ও-ঘরে আর ফিরে যেতে পারব না। তা ছাড়া যা হওয়ার সে তো হয়েই গেছে। এখন আর কী দরকার চারদিকে কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে।

কিন্তু বাপের বাড়ীতেও আর মন টিঁকল না। যে অন্ধত্ব সম্পর্কে এতকাল তার কোনো চেতনাই ছিল না, বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে নিষ্ঠুরতম আঘাত খেয়ে তার আসল চেহারাটা এখন চন্দ্রা দির কাছে এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গেছে। স্বামীকে ছেড়ে আসার এতদিন পরে যেন নিজের আসল অবস্থাটা বুঝতে পেরে কিছুদিন সমানে কাঁদল চন্দ্রা দি।

মনে হল, এই বাড়ীতেও একদিন সকলের কাছে পুরো বাতিল হয়ে যাবে সে—এখানেও সকলের অপমান আর অনুগ্রহ নিয়ে তিলে তিলে দুঃসহ জীবন কাটাতে হবে তাকে। যতদিন স্বামীর কাছে ছিল, ততদিন পর্যন্ত তবু কিছু দাম ছিল তার। এখন সে সংসারের অকারণ বোঝা, সকলের চোখে অহেতুক বাজে খরচ। চন্দ্রা দি মরমে মরে গেল। না—এখানেও নয়।

শেষে একদিন বাপকে গিয়ে বললে, যেখানে হয় আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও। পাঠিয়ে দাও আর কোথাও। নইলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আমি আত্মহত্যা করব।

তারপর এই অন্ধ-নিকেতন। সে আজ বারো-তেরো বছর হয়ে গেল।

এ-সব কথা সম্পূর্ণভাবে চন্দ্রা দির মুখ থেকে কখনো শুনিনি, মধ্যে মধ্যে আভাস পেয়েছি কেবল। মধ্যে মধ্যে নানা জনের কাছ থেকে টুকরো টুকরো খবর জোগাড় করে জুড়ে নিয়েছি একসঙ্গে। আর তা থেকে আর একটা জিনিসও স্পষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে। আমরা অন্ধ—আমরা আলাদা। চোখের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সুর মিলবে না।

দু'জনেই নিজের নিজের ভাবনা নিয়ে চলেছিলুম। পুকুরের আর এক ধার দিয়ে আমরা হাঁটছি। এইখানে ছোট ফোয়ারা আছে একটা, তার ঝিরঝির আওয়াজ কানে এল, গায়ে লাগল বৃষ্টির রেণুর মতো জলের ছিটে।

চন্দ্রা দি দাঁড়ালো।

—কাল দাদা এসেছিল।

ওর দাদার কথা আমরা সবাই জানি। লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ কর্ণেল, পুণায় থাকেন। যখনই চন্দ্রা দিকে দেখতে আসেন, তখনই এখানকার বাচ্চাদের জন্যে নিয়ে আসেন টফি-চকোলেট্‌-লজেন্স, পুতুল, মেকানো সেট্‌। আমাদের এই অন্ধ-নিকেতনও মধ্যে মধ্যে সাহায্য পায় ওঁর কাছ থেকে।

বললুম, শুনেছি। প্রিন্সিপ্যাল বলছিলেন।

—জানো, দাদা এবারও আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

—গেলেই তো পারো।

—দূর, কী হবে গিয়ে?

—কেন, তোমার যেতে ইচ্ছে করে না?

—না, একেবারেই না।

পরিষ্কার, স্পষ্ট গলার স্বর। এতটুকুও জড়তা নেই।

আমার খারাপ লাগল। আমি কিন্তু ঠিক এমনি করে ভাবতে চাই না—ভাবতে পারি না। কী হবে গিয়ে? তা বটে। আমি, আমিও কি তার উত্তর জানি? কিন্তু চন্দ্রা দির মতো তিক্ততার, শূন্যতার স্মৃতি তো আমার নয়। মা-র স্নেহ, সকলের ভালোবাসা, সংসারের উছলে-পড়া মমতা। জগতের কাছে আমার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গেছে, এ কথা আমার মন তো কিছুতেই মানতে চায় না। কোথাও আমার কোনো দাম নিশ্চয়ই আছে—কোনো ভূমিকা আছে।

একদিন সে আমি পাবই। সেই ভূমিকায় আবিষ্কার করব নিজেকে।

—কি ভাবছ হিরণ?—চন্দ্রা দি জানতে চাইল।

—কিছু না।

আবার চুপচাপ। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। আমাকে এখনো সাবধানে চলতে হয়, কিন্তু চন্দ্রা দির কাছে সব সহজ। যে কখনো আলো দেখেনি—তার কাছে সব স্বাভাবিক; শুধু ওই রকম একটা নিষ্ঠুর স্বামীর কাছ থেকে বীভৎস আঘাতটা না পেলে পৃথিবীর ওপর কোনো অভিযোগই করত না চন্দ্রা দি। শুধু দুঃখ তাদেরই—যারা আলো পেয়েও তাকে হারায়। যেমন আমি, যেমন কবি জন মিল্‌টন।

একটা বাজনার স্বর। গীটার বাজছে। একটি অন্ধ ইহুদী ছেলে এখানে এসেছে মাস তিনেক হল। গীটার আর পিয়ানো শেখায়।

চন্দ্রা দি দাঁড়িয়ে পড়লেন: মুনলাইট সোনাটা।

আমি বললুম, বীঠোফেন।

চাঁদের আলোর এই আশ্চর্য সঙ্গীত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুরু—গানের রাজ্যে শেক্স্পীয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আজ দুশো বছরেও পুরোনো হল না। কিন্তু যে অন্ধ কখনো জ্যোৎস্না দেখেনি, দেখেনি নদীর জলে—গাছের পাতায় তার আলোর-ছায়ার নাচ—সে ওর সম্পূর্ণ ইঙ্গিত কী করে বোঝে, কেমন করে পায় ওর বিপুল গভীর সৌন্দর্যের আভাস? কিংবা চোখ না থাকলেও পূর্ব জন্ম-জন্মান্তরের পার থেকে জ্যোৎস্না দেখার স্মৃতি ওই গানে রক্তের মধ্যে জেগে ওঠে: 'জননান্তর সৌহৃদানি।' আজ যা দেখি না—কত আগে, কত অতীত জন্মে তাকে দু চোখ ভরে দেখেছি। তাকি কখনো হারায়—হারাতে পারে? সুর—গান—পাখীর ডাক—জলের শব্দ—অতিচেতনার গভীর থেকে তা উদ্ধার করে আনে, রূপহীন একটা জ্যোৎস্নার আলো সমস্ত মনকে উদ্ভাসিত করে দেয়।

[লেখা বন্ধ করলুম। মনের মধ্যে টুকরো টুকরো চিন্তা আসছে। যে জন্মান্ধ সে দুঃখ পায় না, আলো দেখেও যে হারিয়েছে—দুঃখটা কেবল তারই? অথচ যাঁর পদ্ধতি নিয়ে এই যে কাগজের বিন্দু সাজিয়ে চলেছি—সেই ফরাসী লুই ব্রেলও তো জন্মান্ধ ছিলেন না। তিন বছর বয়সে—বাপের ঘোড়ার জিনের কারখানায় চামড়ার ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে খেলা করতে গিয়ে তিনিও তো অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ লুই ব্রেল ব্যর্থতার মধ্যে হারিয়ে যাননি। শিক্ষক হয়েছেন—অন্ধের লেখাপড়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন—মুনলাইট সোনাটা রচনা হয়তো করেননি—কিন্তু সুরের রাজ্যে তাঁরও তো অনধিকার ছিল না। এক সময় পারীর শ্রেষ্ঠ অর্গ্যানবাদক হয়েছিলেন তিনি।

আমরাও পারি। হেলেন কেলার জীবনে কত বড়ো হয়েছেন। আমিও কেন বড়ো হতে পারব না? কেন নিজের চারদিকে বেদনার বৃত্ত রচনা করে যাই কেবল?

কাকা আসছেন। ভারী অথচ মাপা পায়ের আওয়াজে বুঝতে বাকী থাকে না, মানুষটার আত্মপ্রত্যয় আছে, আর খুব সাবধানী,—হিসেব করে চলেন। লোকের পায়ের শব্দ নিয়ে তার চরিত্র বিশ্লেষণ করবার কোনো বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা কেউ করেছে কিনা জানি না। আমার মধ্যে মধ্যে করতে ইচ্ছে হয়।

কাকা এলেন। চেয়ার টেনে বসলেন বুঝতে পারলুম।

—লিখছিলি বুঝি?

—চেষ্টা করছিলুম অল্প অল্প।

কাকা ব্রেল-ফ্রেমটাকে টেনে নিলেন। টের পাচ্ছি, হাত বুলোচ্ছেন বিন্দুগুলোর ওপর। তারপর মুগ্ধ হলেন।

—আশ্চর্য সায়েন্স। মানুষের কোনো অভাবকে থাকতে দেবে না।

বললুম, তাই।

কাকা ব্রেল সম্পর্কে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন মনে হল: এর ওপর হাত বুলিয়ে তুই সব পড়তে পারিস বুঝি?

—অসুবিধে হয় না।

—তাই দেখছি।—ফ্রেমটা এবার নামিয়ে রাখলেন।—বললেন, তোকে একটা কথা বলব ভাবছিলুম।

আমি জানি, কী বলবেন। টুনটুন সে-কথার আভাস দিয়ে গেছে আগেই। অলসভাবে জিজ্ঞেস করলুম: বলুন।

—এইভাবে সময় কাটাতে তোর ভালো লাগে?

—চলে যায় এক রকম।

—কিন্তু মনটা তো ক্লান্ত হয়ে পড়ে? আর এ-ভাবে বসে থাকতে থাকতে শরীরেরও তো ক্ষতি হয়? আমি বলছিলুম—আসছে সেশনে তোকে বরং ল-কলেজেই ভর্তি করে দেওয়া যাক—কী বলিস?

কাকা কাজের লোক। কারুর বেকার বসে থাকা ওঁর ভালো লাগে না।

আমি তক্ষুনি কোনো জবাব দিলুম না। বেশ তো আছি নিজেকে

নিয়ে। অন্ধ-নিকেতন ছেড়ে চলে আসবার পর থেকে এই নিঃসঙ্গ মনোমন্থনেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই গোল টেবিলটা, আমার ঘরের ওই জানালা, বাতাসের ঝলক, রোদের ছোঁয়া, নীচের পথ থেকে ঠিকরে আসা চলতি-জীবনের ছাড়া ছাড়া ধ্বনির উৎক্ষেপ। আমারো নিজের একটা আলাদা—স্বয়ংবৃত্ত পরিবেশ তৈরী হয়ে গেছে। আমি কি আর ভিড় সইতে পারব এখন?

—তোর আপত্তি নেই তো?

কাকার জিজ্ঞাসা। এবার আমি বললুম, কী হবে পড়ে?

—পড়ে কী হবে?—কাকা একই সঙ্গে উত্তেজিত এবং উৎসাহিত হলেন। আমাকে বোঝাতে শুরু করে দিলেন বক্তৃতার ভঙ্গিতে। বলে চললেন, কত উকিল-ব্যারিস্টার অন্ধ হয়েও কেমন নাম কিনেছেন, পশার জমিয়েছেন দুর্দান্তভাবে। আমি কিছু শুনছিলুম, কিছু কথার খেই হারিয়ে ফেলছিলুম। এ ধরনের কৃতী অন্ধ মানুষদের নামের তালিকা শুনতে আর আমার উৎসাহ হয় না। আমাদের অন্ধ-নিকেতনে এ রকম নামের তালিকা আগে শুনেছি দিনের পর দিন, শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, সারা পৃথিবীর বাছা-বাছা নামের দীর্ঘ বিবরণ।

কাকা ঠিক আর্গুমেন্ট্ ধরবার ভঙ্গিতে কথা বলেন। টুনটুনের বাবা হয়েও তার সঙ্গে ওঁর কত তফাত। টুনটুন কথা কইলে মনে হয় টুপটুপ করে শিশির পড়ছে, ভরা দুপুরে কুম্-কুম্ করে নিরালায় পায়রা ডাকছে, রাঁচীতে গিয়ে গৌতমধারার যে শব্দ শুনেছিলুম—তেমনি করে ঝর্ণা ঝরছে। অথচ, কাকা পুরোপুরি সংসারের মানুষ। কথার মধ্যে জোর দেন—যেখানে যেমন দেওয়া দরকার; প্রত্যেকটা শব্দের পেছনে ভারী ভারী অর্থ থাকে। আমার এই লেখাগুলো যদি পড়তে পারতেন, তা হলে নির্ঘাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন বাজে কাগজের ঝুড়ির ভেতরে।

কাকা বেশ সাজিয়ে সাজিয়ে আনলেন যুক্তিগুলো। অভ্যাসে আমার টেবিলে একটা কিলও যেন মারলেন বলে মনে হল। আমার ভয় হচ্ছিল, কখন আচমকা আমাকে বলে বসবেন, ইয়োর লর্ডশিপ।

তবু কাজের লোক, বেশিক্ষণ সময় পান না। কেসটা যেন জুরীদের সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন, শেষে এইভাবে বললেন, তা হলে ভেবে দেখিস।

—আচ্ছা ভাবব।

কাকা উঠলেন, চেয়ার সরল একটু। তারপর ভারী আর মাপা পায়ে চটির আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। নীচে হয়তো মক্কেলরা এসে প্রতীক্ষা করছে।

কী হবে কৃতী অ্যাডভোকেট হয়ে? জিনিসটা আমি সত্যিই কল্পনা করতে চেষ্টা করি। ধরা যাক, খুব নামকরা উকিলই না হয় হওয়া গেল; অনেক টাকাই রোজগার করতে আরম্ভ করলুম; কিন্তু তারপর?

তার পরের কোনো জবাব নেই। আমাদের প্রাচীনকালের সেই ব্রহ্মবাদিনী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্যাম? ও তো গেল আধ্যাত্মিকের কথা। কিন্তু অমৃতের ভাবনা আমার নয়। অনেক টাকা আলোর জগতে আমার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? আমি দেখতে পাব টুনটুনের মুখ—যাকে আমার বৃন্তের ওপর একটা রজনীগন্ধা বলে মনে হয়? আমি কি দেখতে পাব আমার ছেলেবেলার পুতুল কেমন করে একুশ বছরের রঞ্জা হয়ে উঠল? তা যদি না হয়—তা হলে এখন যতটুকু পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি সুখ আমি কোথায় পাব? কেমন করে পাব?

আমি অন্ধ। জন্মান্ধদের আলো-না-দেখা স্বাভাবিক তৃপ্তির জগতে আমার বাস নয়। নিজেকে সাধ্যমতো ভোলাই, তবু কি ভুলতে পারি সম্পূর্ণ? মিল্‌টনের যন্ত্রণা কি আমার মধ্যেও জেগে ওঠে না—যখন টুনটুনকে দেখবার একটা ব্যাকুল ইচ্ছার বন্যা আমার মনের ভেতরে ফেনিয়ে ওঠে? বোঝা আর আমি বাড়াতে চাই না। আমি বেশ আছি। চক্ষুষ্মানদের মিথ্যে নকল করে আমার কী হবে?

আমার কোনো দরকার নেই। কাকা মিথ্যেই ভাবছেন আমার জন্যে।

তবে হ্যাঁ—অ্যাড্‌ভোকেট হয়ে রোজগার করতে পারলে মা-র কাজে লাগবে। মা-র তীর্থ করবার সখ। কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-হরিদ্বার দেখিয়ে আনতে পারি মাকে। আমার দেখবার অবশ্য উপায় নেই।

ভেবে দেখব কাকার কথাটা।

আবার লেখা আরম্ভ করলুম।]

চন্দ্রা দিকেই ভাবছি।

একবার খুব অসুখে পড়েছিলেন। টাইফয়েড। শেষের দিকে তো প্রায় যমে-মানুষে টানাটানি চলেছিল কিছুদিন। আমি দেখতে যেতুম দু বেলা। তখন চন্দ্রা দি বলেছিলেন, এই ওষুধ আর ডাক্তারের উৎপাত আমার আর সহ্য হয় না।

—ওষুধ না হলে কী করে ভালো হবে চন্দ্রা দি ?

—কে চায় ভালো হতে ? আশীর্বাদ করো যেন আর সেরে না উঠি।

—মিথ্যে তুমি মরতে চাও কেন ?

—কী হবে বেঁচে থেকে ?

জানি না কেন, বলে ফেলেছিলুম, মরে গিয়েই বা কী লাভ হবে বলো তো ?

অসুখ অবস্থাতেও চন্দ্রা দি চমকে গিয়েছিল। হয়তো এদিক থেকে কোনোদিন ভাবেনি। জীবনের চাইতে মৃত্যু যে ঢের ভালো, একথাই বা কে বলতে পারে ? মরণের ওপারে যে আরো বড়ো দুঃখ লুকিয়ে নেই—চোখের জন্যে অপেক্ষা করে নেই আরো গভীর অন্ধকার—এমন নিশ্চয়তা কে দেবে ?

একটু থেমে জবাব দিয়েছিল, তা হলে এ দুঃখ আর বইতে হয় না।

—দুঃখ কোথায় চন্দ্রা দি ? কিসের দুঃখ ?

চন্দ্রা দি আবার চুপ করে থেকেছিল কিছুক্ষণ। তারপর কথাটা আমার ওপরেই চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।

—কিসের দুঃখ তুমি কি জানো না ?

না—আমি জানি না। আজ যখন টুনটুনকে দেখতে পাই না, যখন আলোর বৃত্তের মধ্যে ষোলো বছর পরে পুতুলকে মিলিয়ে নিতে পারি না রঞ্জা দাশগুপ্তের সঙ্গে, তখন হয়তো জন মিল্‌টনের সঙ্গে কোথাও নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পাই, মনে হয় 'অন্ হিজ ব্লাইণ্ডনেসের' কথা। তবু এও তো সাময়িক। এই সব ছোটখাটো মুহূর্তের বেদনা থেকে নিজেকে যখন কিছুটা বিচ্ছিন্ন করতে পারি, একটা সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে যখন দেখি চারদিকে, তখন তো মনে হয় না আরো কারো চাইতে আমার দুঃখের পরিমাণ বেশি। অভাববোধ সংসারের প্রত্যেকের আছে—কে জোর গলায় বলতে পারে, আমি সব পেয়েছি—আমার চাইবার আর কিছুই নেই ? কাকা প্রচুর রোজগার করেন—কিন্তু কোন্ এক মক্কেল কবে একশোটা টাকা ওঁকে ফাঁকি দিয়েছে—এ ক্ষোভটা তো কিছুতেই ভুলতে পারেন না।

অন্যের চাইতে সুখ আমার বেশি না থাক—দুঃখটাও তো বেশি নয়। পৃথিবী আর সকলের মতো আমার জন্যেও তার স্নেহের কোলটি মেলে রেখেছে। বাতাস আমাকে ছুঁয়ে যায়, ফুলের গন্ধ আমাকে প্রত্যেকদিন সুখী করে, গান আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'অন্ত নাই গো যে আনন্দে ভরা আমার অঙ্গ।' আমার অন্ধ দু-চোখের সামনে স্মৃতিটা স্বপ্নের বৃত্ত রচনা করে রেখেছে। আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের অনুভব প্রতি পলে পলে সেই বৃত্ত থেকে—সেই বৃত্তের বাইরে ধ্বনি-গন্ধ-স্পর্শের অরূপ মধুচক্র থেকে মাধুকরী করে। মা-র হাতের সেই পদ্মনিভ স্পর্শটি পাই, টুনটুনের সেতারে বাজে সারং, ওরই গলায় আবৃত্তি শুনি : 'আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী।' কোনো কোনোদিন গ্রামোফোন রেকর্ড এনে টুনটুন আমায় শোনায় কবিকণ্ঠ : 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো বলে তারে গাঁয়ের লোক—'

আমার অন্ধকারে পৃথিবী কৃষ্ণকলি হয়ে ওঠে। তাকে দৃষ্টিবানেরা যাই বলুন, আমি তার অরূপ পাপড়িগুলিকে একটির পর একটি স্পর্শ

করি ; প্রণাম করি সেই তিমিরপর্ণা কৃষ্ণা বসুমতীকে, প্রণাম করি এই জীবনকে—যেখানে 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' 'কী পাইনি তার হিসাব মেলাতে' গিয়ে দেখি কত পেয়েছি—কত বেশি করে পেয়েছি। জীবন একটা ক্ষতিরই খাতা মাত্র—কে তৈরী করে রেখেছে এমন একপেশে হিসেব?

"Our own affections still at home to please
In a disease :
To cross the seas to any foreign soil,
Peril and toil :
Wars with their noise affright us ; when they cease,
We are Worse in peace—
What then remains—"

এক তরফা—এক তরফা। এ শুধু নিজের মনের বিকারে শূন্যতার যোগফল টেনে নামানো। কিন্তু আমি দেখেছি—তোমার আমার ক্ষত আর ক্ষতিপূরণের জন্যে দিকে দিকে কী আয়োজন! একজন দুঃখ দেয় (আমাকে কেউ দিয়েছে বলে মনে পড়ে না), দশজন এসে মাধুর্যের প্রলেপ দিয়ে জুড়িয়ে দেয় তাকে ; বছরের দশদিন কাটে ব্যাধির বিকারে, বাকী তিনশো পঞ্চান্ন দিন সুস্থ শরীর বাতাসে স্বাস্থ্য লাভ করে, সূর্যের আলো দিয়ে রক্ত-কণিকার নবোজ্জীবন ঘটায়।

সেদিন এত কথা হয়তো ভাবিনি। তবু চন্দ্রা দিকে নিঃসংশয়-ভাবেই জবাবটা দিয়েছিলুম।

—না, আমার কোনো দুঃখ নেই।

চন্দ্রা দি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, ছেলেমানুষ—তাই এখনো তোমার আশা আছে। আরো কিছু বড়ো হও, তখন বুঝতে পারবে।

আট-ন বছর তো পার হয়ে গেল তারপর। যথেষ্ট বড়ো হয়েছি কিনা জানি না। কিন্তু যে দুঃখ এপারের জীবনটাকে মিথ্যে করে দেয়,

—যে দুঃখ মানুষের শরীরকে কোনো বিবর্ণ শীতের রাতে লাশ কাটা ঘরের হাতছানি পাঠায়, সেই দুঃখের সন্ধান তো আমি এখনো পাইনি। আর বার বার এই কথাই তো আমার মনে হয়েছে, একদিনের একটুখানি দুঃখকেই আমরা বড়ো বেশি করে মনে রাখি—জমা-খরচের খাতায় দশ দিনের আনন্দটুকুকে তুলে রাখতে ভুলে যাই।

তবে এইটুকু মানি, খুশি হতুম টুনটুনকে দেখলে—রঞ্জাকে দেখতে পেলে।

আমার এই লেখাগুলো যদি রঞ্জা পড়তে পারত, বেশ হত তা হলে। আমি মনে মনে বলতুম, 'তুমি যদি এরে লহো কোলে তুলি, তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি, সকল অগীত সঙ্গীতগুলি হৃদয়াসীনা।' কিন্তু দৃষ্টিহীনের জন্যে অন্ধ সরস্বতী চাই, না হলে আর কারো হাতের ছোঁয়ায় আমার মর্মবিন্দুগুলি তো গান হয়ে উঠবে না!

আচ্ছা—রঞ্জাও যদি অন্ধ হয়ে যেত?

ছিঃ ছিঃ ছিঃ—এসব কী ভাবছি আমি!

টং—টং—টং—

ঠিক এগারোটা। কান পেতে গুনে গুনে দেখলুম। লেখা বন্ধ করব এখন। মা'র গলার শব্দ পাচ্ছি। এবার স্নান করতে হবে।

আমি অ্যাড্ভোকেট হলে মা কি খুব খুশি হবেন?

॥ ছয় ॥

আমি কাকার পাশে বসেছিলুম। বুঝতে পারছি, হলঘর লোকে বোঝাই হয়ে গেছে। অনেকগুলো পাখার বাতাসে যেন ঝড় বইছে; আমার কেমন শীত-শীত করছে মধ্যে মধ্যে। শাড়ীর আওয়াজ প্রসাধনের গন্ধ, পুরুষের মোটা গলার আওয়াজ, মেয়েদের কলধ্বনি—

বাচ্চাদের কাকলি। জানি, স্টেজ থেকে খুব দূরে নেই আমরা। নিশ্চয়ই কয়েকটা খুব জোরালো আলো জ্বলছে সামনে, আমার দু-চোখের ওপর যেন কেমন এক-একটা উত্তাপের ঢেউ থেকে থেকে দুলে যাচ্ছে।

সমুদ্রের ঢেউয়ে আছড়ে-পড়া ঝিনুকের খোলা পাহাড়ের গায়ে লেগে যেমন করে দু ফাঁক হয়ে যায়, তেমনি এই আলোর তরঙ্গে—এই বহু মানুষের সংঘাতে হঠাৎ যদি আমার চোখের দৃষ্টি খুলে যায়? এত আলো, এমন ভয়ঙ্কর আলো আমি কি তবে সইতে পারব? চোখের যে তারা দুটো অন্ধকারের স্নিগ্ধ ছায়ায় শীতল তৃপ্তিতে তলিয়ে আছে—অত আলোতে তারা হয়তো শেষ পর্যন্ত মোমের মতোই গলে যাবে।

অথচ, ছেলেবেলায় অন্ধকারকে কী ভয়ই যে আমার ছিল!

ভাবনায় ছেদ পড়ল। মাইকে মেয়েলী গলার ঘোষণা।

ঃ এইবার আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হচ্ছে। প্রথমেই উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইছেন—আমাদের প্রাক্তন ছাত্রী রঞ্জা দাশগুপ্ত।

আমি নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসলুম। হাততালির তরঙ্গ উঠল ঘরময়। বোঝা গেল, এখানে সবাই-ই রঞ্জার গুণমুগ্ধ। কেবল আমিই জানতুম না। আমার ছেলেবেলার পুতুল খেলার ঘরেই সঞ্চিত হয়ে পড়েছিল এতদিন।

রঞ্জা গান ধরল ঃ

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে—'

চেনা পরিচিত গান। কতবার কতজনকে আমি গাইতে শুনেছি। কিন্তু আজ এই অনুষ্ঠানে মধু-ঝরানো গলায় যে গাইছে, তাকে আমি দেখেছিলুম ছেলেবেলায়। সে তো এ নয়।—সেই ঝুঁটিবাঁধা ছোট লোভী মেয়েটি গান গাইতে পারত না। সেদিন গানে দিদিরই ছিল একচেটে অধিকার। তার টুকরো টুকরো কথা মনে আছে—গম্ভীর হয়ে সে আমার বইখাতা দাবি করত। মাসিমা বলতেন, দেখেছেন দিদি,

এইটুকু মেয়ের কেমন পট্‌পট্‌ করে কথা ! আর তার কান্নার সুর আমার কানে লেগে আছে—ঝুঁটি ধরে যেদিন একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলুম।

এ সে নয়। আমাকে এ চেনে না—আমিও কি চিনি ? আমার কথা রঞ্জা দাশগুপ্ত হয়তো কোনোদিন শোনেও নি।

'একি নিবিড় বেদনা বনমাঝে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে—'

সেই নীলকুঠির পথের ধারে ভাঁট ফুল দুলছিল বসন্তের হাওয়ায়। সবুজে লালে ছেয়ে গিয়েছিল কাঠবাদামের পাতা। সজনে ফুল ঝরছিল কাদের যেন বাঁশের বেড়ার ধারে। কিন্তু আমি আমার নিজের পরিণামের জন্যে এগিয়ে চলেছিলুম একটা অন্ধকার ইঁদারার দিকে—যার ভেতরে দুটো উজ্জ্বল চোখ অপেক্ষা করছিল আমারই চোখদুটোকে কেড়ে নেবার জন্যে।

আজ মনে হয় কোনো বড়ো জাতের সাপ ছিল ওর ভেতরে, হয়তো দাঁড়াশ, হয়তো অজগর। কিংবা—

হাততালির আওয়াজে আবার সজাগ হয়ে উঠি। গান শেষ হয়েছে। কে কে যেন বললে, 'আরো দু-একখানা গান হোক।' মাইকে আবার ঘোষণা করা হল, পরে ইনি আবার গান শোনাবেন, তার আগে অন্য অনুষ্ঠানগুলো হয়ে যাক।

বক্তৃতা। আবৃত্তি। গীটার বাজালো কে যেন। আমার অন্ধ-নিকেতনকে মনে পড়ল। আর চন্দ্রা দিকে। সেই ইহুদী ছেলেটি। মুনলাইট সোনাটা বাজাচ্ছিল। অন্ধ লুই ব্রেল্‌ পারীর কোন্‌ মিউজিক হলে অর্গ্যান বাজাতেন ? মুনলাইট সোনাটা কি তিনি বাজিয়েছেন কোনোদিন ? অন্ধের চোখে চন্দ্রালোকের রূপ কেমন ভাবে ফুটে উঠেছিল ? অথবা পিয়ানো ছাড়া কি মুনলাইট সোনাটা বাজানো যায় ? আমি ও-সব জানি না। চন্দ্রা দি থাকলে বলতে পারত।

আবার রঞ্জার গান। পর পর তিনখানা। আরো বলিষ্ঠ, আরো বেশি উজ্জ্বল। সব শেষে গাইল মীরার ভজন। যেমন গলা, তেমনি

সুরের কাজ। চন্দ্রা দিও তো মীরার ভজন পছন্দ করত। তার চাইতেও কি ভালো গাইল? হয়তো—হয়তো নয়। এর গান যেন দুপুরের আলোর মতো—গড়াই নদীর স্রোতের ওপর দিয়ে নেচে বেড়ায়; আর চন্দ্রা দির গান ছিল ভোরের আলোর মতো—তখনো রাত্রি-মাখানো, তখনো শিশির-দিয়ে ভেজা।

আমা" মনে হচ্ছে, সেই গানই ছিল ভালো। রাত্রি নামলে যে-আলো নদীর বুক থেকে পালিয়ে যায়—সে নয়; কালো জলের ওপর যে তারাটি তার ছোট্ট আলোর করুণ দোলাটি পাঠিয়ে দেয়—তার মমতা অনেক বেশি। দুপুরের আলো সকলের, তারার আলোটি রাত্রির নদী ছাড়া আর কারুর নয়।

মাইকে আবার উদ্‌ঘোষণ। 'মুক্তধারা' আরম্ভ হল।

যন্ত্ররাজ বিভূতির যন্ত্রের চূড়ো উঠেছে আকাশে। ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূলকে ছাপিয়ে চন্দ্র-সূর্যকে বিঁধতে চাইছে তার উদ্ধত মাথাটা—যেন স্পর্ধা করছে দেবতাকে, ব্যঙ্গ করছে স্বর্গকে। এমন কি, রাজার পর্যন্ত মনে হয়, অতটা উঁচু করে তোলা ভালো হয়নি। কিন্তু বিভূতি নির্বিকার। সে জানে শিবতরাইকে যে পিপাসার জল দিয়েছেন দেবতা, সেই জল কেড়ে নিয়ে দেবতার মহিমার ওপরে প্রতিষ্ঠা করবে নিজের সিংহাসনকে। আজ তারই বন্দনা উঠছে দিকে দিকে।

'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র—'

অভিনয় চলছে। রাজা এলেন, মন্ত্রী এলেন, গুরু এল, বটুক এসে ডেকে বলে গেল—'সাবধান—সাবধান।' এইবার কার গলা শুনছি? আমার মনে মনে ছোট্ট মা বলে যাকে ডাকতে ইচ্ছে করে সে-ই এসেছে অভিজিৎ হয়ে। অতটুকু মানুষটিকে কেমন দেখাচ্ছে রাজপুত্রের ভূমিকায়?

কাকাকে সে কথা জিজ্ঞেস করলুম।

কাকা হাসলেন। প্র্যাক্‌টিক্যাল মানুষটি একটু শিথিল হয়েছেন এই মুহূর্তে, গলায় আনন্দিত গর্বের আভাস।

—না, খুব মন্দ দেখাচ্ছে না। মেয়েটার তো পার্টস্‌ আছে দেখছি।

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় কাকা নিজের মেয়েকে আবিষ্কার করলেন। কিন্তু কী যেন বলছে টুনটুন? না-না, অভিজিৎ?

“আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে। চেয়ে ছাখো ওই পাখি দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ওকি নীড়ে যাবে, না অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানিনে; কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে, সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে। সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আমি আজ নমস্কার করি।”

মুক্তধারার বন্ধন খসিয়ে তাকে মুক্তি দেবে অভিজিৎ। ধরণীর সমস্ত সঙ্গীত রুদ্ধ করে দিয়ে যা বীভৎস লোহার দাঁত আকাশে মেলে দিয়ে অট্টহাসি হাসছে—তাকে ভেঙে না ফেলা পর্যন্ত তারও তো মুক্তি নেই।

এই আশ্চর্য আশা, এই অসীম শক্তিকে আমার ভালো লাগে। মানুষ ভয় পায় না—মানুষ হারতে জানে না। যখন রাতের অন্ধকার নিবিড়, নিথর হয়ে নামবে উত্তরকূটের ওপর, যখন প্রলয়ের কালো মেঘ পাথরের মতো নিথর হয়ে সারা আকাশকে আচ্ছন্ন করে ধরবে, তখন সেই তমসার মধ্যে—চোখের আলো ডুবে যাওয়া সেই নীরন্ধ্র কৃষ্ণতার ভেতরেও অভিজিৎ পথ খুঁজে পাবে। তার যাত্রাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। সে আলো তো আমারও। আমিও অন্ধকারের মধ্যেই পথ চলেছি। অভিজিতের যেমন লক্ষ্য আছে, তেমনি একটা লক্ষ্য তো আমার জন্যেও রয়েছে কোথাও। কিন্তু তার কোনো সন্ধান আমি এখনো পাইনি; আমি এখনো জানি না কোন্‌ মুক্তধারাকে মুক্তি দেবার ভার পড়েছে আমার ওপর।

কোনো-না-কোনো ভার নিয়ে পৃথিবীতে সবাই আসে। হেলেন কেলার পেয়েছেন সে ভার—লুই ব্রেল্ পেয়েছেন। আমি?

নাটক চলছে। অম্বার কান্নায় ভরে উঠল চারদিক। কোথা থেকে ছুটে এল ধনঞ্জয়: 'আগুন, আমার ভাই, আমি তোমারি জয় গাই।'

সে আগুন অভিজিতের লোহার শেকল দিলে গলিয়ে। তিমিরের অভিযানে যাত্রা করল অভিজিৎ। তারপর অন্ধকারের বুকে উচ্ছলিত হল মুক্তধারার কল-হাসি, নেমে এল বাঁধন ভাঙা প্রাণের স্রোত (কাকা হঠাৎ বললেন, 'বেশ সাউণ্ড-এফেক্ট এনেছে তো এখানে')—আর তারপরে সেই প্রবল জীবন-প্রবাহে অভিজিতের চির-মুক্তি।

'বজ্রঘোষ-বাণী
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর,
শঙ্কর শঙ্কর।'

গানের সুরে গমগম করে উঠল হলটা। আবার আমার চোখে জল এল। মনে হল যে শান্ত অন্ধকারের ভেতর নিজেকে নিয়ে এতদিন মগ্ন হয়েছিলুম, সে আমার নিজেকে, আমার নিজেকেই ভোলানো। পরাজিত অবসাদের মধ্যে আমার নির্বাসন। আমারও মুক্তি চাই। কিন্তু কী সেই মুক্তি? কেমন করেই বা আমি তাকে পাব?

কখন যে সব শেষ হয়েছে জানি না। চারদিক থেকে ভিড় ভেঙে কোন সময় যে সবাই গেটের দিকে এগোতে আরম্ভ করেছে তারও কিছুই আমি টের পাইনি। আমি যেমন ছিলুম তেমনিই বসে রইলুম একভাবে।

তারপর শুনলুম টুনটুনের গলা।

—বাবা, এই যে রঞ্জা দি।

আমার রক্ত চমকে উঠল, উত্তেজনায় তীব্র প্রখর হল স্নায়ুগুলো। আমি অনুভব করলুম, টুনটুনের পাশে আর একজনকার দীর্ঘ উজ্জ্বল

উপস্থিতি। টুনটুন যদি রজনীগন্ধা হয়—সে উগ্র সুরভিত গোলাপগুচ্ছ।

রঞ্জা বোধহয় কাকাকে প্রণাম করল। কাকার আশীর্বাদ শুনলুম, কল্যাণ হোক মা—কল্যাণ হোক। বড় ভালো লাগল তোমার গান।

—আর আমার অভিনয় বুঝি ভালো লাগল না বাবা ?—টুনটুনের জিজ্ঞাসা।

—কেন ভালো লাগবে না ? সব ভালো হয়েছে—কাকা অপ্রতিভের মত জবাব দিলেন।

আমি ভাবছিলুম, এমনি নেপথ্য শ্রোতার ভূমিকাতেই বুঝি দাঁড়িয়ে থাকব—এর মধ্যে আমার কোনো ভূমিকাই বুঝি নেই। কিন্তু তার পরেই শুনতে পেলুম, রঞ্জা দি—এই আমার সোনা দা। হিরণ সেন।

একটি উজ্জ্বল গলার বিদ্যুৎ এগিয়ে এল আমার দিকে।

—নমস্কার !

—নমস্কার।

—টুনটুন রাতদিন আপনার গল্প করে, বলে—কী যেন সামলে নিলে রঞ্জা। হয়তো আমার চোখ নেই বলে যে সহানুভূতি জানায়, সেইটেই সে চেপে গেল। তারপর বললে, মার কাছেও শুনেছি আপনাদের কথা। ছোটবেলায় আমি নাকি খুব দুরন্ত ছিলুম আর ভীষণ বিরক্ত করতুম আপনাকে।

টুনটুন হেসে উঠল, কাকাও হাসলেন মনে হল।

ষোলো বছর আগেকার পুতুল। 'আর একটা ফুল দাও—ওই লাল বড় ফুল-টা।' আমার স্মৃতির ভেতর দুটি নতুন পাতাকে ধরে রেখেছি কেবল, এখন উগ্র সুরভিত গোলাপগুচ্ছ এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। অনেক বড়ো একটা আকাশের নীচে—অনেক মুগ্ধ চোখের আলোজ্বলা দৃষ্টির সামনে এখন সে ফুটে উঠেছে, নিজেকে জেনেছে। তার ছোট ছোট পায়ের চিহ্নগুলো আমাকে ছাড়িয়ে কত দূরে এগিয়ে চলে গেছে,

আমার ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে কেবল তার একটি মাত্র ছাঁচ তুলে নিতে পেরেছি !

কথাগুলোকে ভাবলুম মুহূর্তের মধ্যেই। তারপর আমিও হাসতে চাইলুম রঞ্জার কথায়।

—হ্যাঁ, সে গল্প আমিও শুনেছি।—আর আজকে ওর কাছে কিছুতেই হার মানব না বলে, একটুখানি মিথ্যে কথাও জুড়ে দিলুম : তবে এতদিন পরে আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু ডাক নামটা যেন কী ছিল ? পুতুল নয় ?

—পুতুলই বটে !—রঞ্জা হেসে উঠল : বাড়ীতে অবশ্য সে বদনামটা এখনো রয়েছে।

—বদনাম কেন ?—প্রসন্নভাবে কাকা জানতে চাইলেন : তোমার পছন্দ হয় না বুঝি ?

—একদম না। কেমন ছেলেমানুষী বলে মনে হয়।

ছেলেমানুষীই বটে ! ফিফ্‌থ ইয়ারের ছাত্রীর আত্মসম্মানে ঘা দেয় এখন। কেবল আমারই মনের বয়স বাড়ে না। শুনেছি, পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে মহাশূন্যের অন্ধকার অনন্ত পথে যে মানুষ ছুটে চলবে, তার আর বয়েস বাড়বে না। আমিও সেই মহাশূন্যতার যাত্রী। আমার গোল টেবিলটার মতোই পায়ের নীচে পৃথিবীর সবুজ বৃত্তটা ঘুরপাক খাচ্ছে অবিরাম। সময়হীন—বয়সহীন কালের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়ে—নিত্য শিশুর স্থির-চিরন্তন দৃষ্টি নিয়ে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি।

রঞ্জা কথা বলছে। আমাকেই বলছে।

—মা বলেছেন একদিন যাবেন আপনাদের ওখানে। আজকেও মা-র এই ফাংশনে আসবার কথা ছিল, হঠাৎ বিকেলে রিউম্যাটিক পেনটা বেড়ে ওঠায় আর আসতে পারলেন না।

—তাহলে আপনারা কিন্তু খুব শীগ্‌গির আসছেন আমাদের ওখানে।—টনটনের ব্যাকুল কণ্ঠ।

—দেখি, মার কবে সময় হয়। আচ্ছা ভাই আসি আজ। অনেক রাত হয়ে গেল।

রঞ্জা বোধহয় আবার প্রণাম করল কাকাকে। কাকা বললেন, কল্যাণ হোক মা—কল্যাণ হোক।

—তাহলে চলি ভাই এনাক্ষী। নমস্কার হিরণ বাবু—

—আসবেন কিন্তু।—আবার মিনতি টুনটুনের।

—আসব—আসব—

হেসে চলে গেল রঞ্জা। গোলাপগুচ্ছের উগ্র সৌরভ দূরে মিলিয়ে গেল, আমার সতর্ক-সচেতন প্রত্যেকটি স্নায়ু দিয়ে আমি তা অনুভব করলুম।

আমরাও বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। আর ট্যাক্সিতে একটানা উচ্ছ্বাসের পালা টুনটুনের।

—তোমরা বুঝি ছেলেবেলায় এক জায়গাতেই থাকতে সোনা দা? সত্যি কি মজা! জানো সোনা দা—রঞ্জা দির মতো মেয়ে হয় না। যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি সুন্দর স্বভাব। আর গান তো নিজের কানেই শুনলে! আমাদের বাড়ীতে এলে কী যে চমৎকার হবে!

জানতে ইচ্ছা করল, এখনো কুলের ওপর সেই লোভটা আছে কিনা রঞ্জার। কিন্তু সে কথা তো সত্যিই জিজ্ঞেস করা যায় না। রঞ্জা এলে খুব খুশি হবে টুনটুন। গল্প করবে, গান শুনবে। মাও তাঁর পুরোনো দিনের আলাপ ঝালিয়ে নেবেন প্রাণ খুলে। এ কোথায়—সে কোথায়—তার খবর কী? বেশ ছিলুম দিদি ওখানে—জিনিস-পত্তরের কী সুবিধেই যে ছিল! রঞ্জার মা-ও পুরোনো সখী-সংবাদে উচ্ছল হয়ে উঠবেন। কেবল আমারই খুশি হওয়ার কিছু নেই। রঞ্জা এসে আমার কাছে আর কুল কিংবা তেঁতুল খেতে চাইবে না—আমিও আর ওসব খাই না এখন। আমার ব্রেল-ফ্রেমটা নিয়ে সে উলটো করে বসে আর পড়বে না: ক-গ-অ-অ—

টুনটুন রঞ্জার আরো কী সব গুণাবলী ব্যাখ্যা করছিল, ঠিক সেই সময় ঘটল ব্যাপারটা।

জোরে ব্রেক কষল ড্রাইভার। নিদারুণ ঝাঁকুনি খেয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে ভয়ঙ্কর ভাবে চমকে উঠলুম।

কাকা বললেন, আরে, ঈস্‌-ঈস্‌-ঈস্‌!

পথে নিদারুণ কোলাহল উঠেছে। টুনটুন বলছে, কী হল বাবা—কী হল?

ড্রাইভারই জবাব দিলে, একটা অন্ধ ভিখিরী। একেবারে চাপা পড়ে গেল ট্রামের তলায়।

অন্ধ ভিখিরী! কথাটা যেন বন্দুকের গুলির মতো আমার মাথায় এসে বিঁধল। চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল টুনটুন।

আর কাকা ছটফটিয়ে বললেন, ওসব আর দেখবার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি বার করে নিয়ে যাও গাড়ীটা।

পথে আর একটা কথাও হল না।

সেদিন রাতে কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তি জ্বলতে লাগল সারা শরীরে। ভালো করে ঘুমুতে পারলুম না আদৌ। বার বার তন্দ্রার মতো এসেই ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপট-লাগা শরতের মেঘের মতো ভেঙে ভেঙে সরে যেতে লাগল। কখনো যেন শুনছি রঞ্জার গান: 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'—তারপরেই তাকে ছাপিয়ে উঠছে অম্বার কান্না: 'সুমন, আমার সুমন!' আর হাল্‌কা হাল্‌কা স্বপ্নের ভেতর মনে হচ্ছে, আমি যেন অভিজিতের মতো অতল কালো অন্ধকারের পথ ঠেলে কোথায় চলেছি, কোথায় কে যেন একটা বিরাট যন্ত্রের মাথা দাঁড় করিয়েছে আকাশে: হাওড়ার ব্রীজটাই ও রকম দেখাচ্ছে নাকি? আমি ওই ব্রীজটাকে দেখিনি, বর্ণনা শুনেছি—ওটা আমার মনকে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে

ভরে দেয়। ও তো মুক্তধারার বাঁধ নয়—মানুষের বিজয়-মিনার! ভাবতে ভাবতে পথ চলেছি, হঠাৎ—

হঠাৎ দৈত্যের মতো ছুটো লাল চোখ জ্বেলে একটা ট্রামগাড়ী ছুটে এল। আমি যেন সেই ছুটো চোখের আকর্ষণে সরে যেতে পারলুম না। নীলকুঠির ইঁদারা থেকে সেই অগ্নিচক্ষুছুটো পনেরো গুণ কুড়ি গুণ বড়ো হয়ে আমার কাছে চলে এল, শুনলুম লোহার কর্কশ আওয়াজ—ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলুম মাটিতে, কয়েকটা নিষ্ঠুর চাকা আমার বুকের পাঁজড়া গুঁড়িয়ে—

চাপা চিৎকার করে জেগে উঠলুম। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। দপদপ করছে মাথার ভেতরে, বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে একটা। গলা শুকিয়ে একরাশ বালির মতো খরখর করছে। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে এলুম।

আঃ—জল খেয়ে একটুখানি ভালো লাগছে তবু। আমি উঠে বসলুম বিছানায়। আজ আর ঘুম হবে না। রাতও বোধহয় বেশি বাকী নেই আর। বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসছে ঘরে।

লেখার যন্ত্রটা টেনে নিয়ে বসে বসে এতক্ষণ লিখেছি। সেই ভোর তিনটে থেকে লিখছি—এখন বোধ হয় সাতটা হবে। আমার এই অসংখ্য বিন্দুগুলোর ভেতরে ধরা পড়েছে রঞ্জার গান, মুক্তধারা নাটক—ছুঃস্বপ্নে ভরা তন্দ্রার টুকরোগুলো।

[কিন্তু আর হাত চলছে না। মাথার ভেতরে আবার দপ দপ করতে আরম্ভ হয়েছে, বুকেও যন্ত্রণা হচ্ছে যেন। আর লিখতে পারছি না। বুকের নীচে ছুটো বালিশ টেনে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। উঃ, এই সময় মা-র হাতখানা যদি একবার কপালে পড়ত! কিংবা টুনটুনের ছোট ছোট আঙুলগুলো যদি মাথার ছু-পাশটা টিপে দিত আস্তে আস্তে!

সেই অন্ধ ভিখারীটা কি মরে গেছে? সেই যে ট্রামের তলায় চাপা পড়েছিল?

না—আমি সে কথা স্বীকার করব না। ও আমার আপনার জন। যেদিন থেকে আমি চোখ হারিয়েছি, সেদিন থেকে পৃথিবীর সব অন্ধ আমার আত্মার আত্মীয়। নিশ্চয় ওর বিশেষ কিছু লাগেনি, নিশ্চয় ওকে ফার্স্ট এইড্ দিয়েই ছেড়ে দিয়েছে হাসপাতাল থেকে। হোক ভিখারী —তবু ওর বেঁচে থাকার কিছুমাত্র প্রয়োজন যে নেই, এ কথা মানতে আমার মন চায় না। হয়তো ওর ঘরে স্ত্রী আছে—যে দুঃখের সংসারেও সেবা মমতা দিয়ে ওকে ঘিরে রাখে, হয়তো ওর সন্তান আছে, যে—

কিন্তু চোখের সামনে সব এমন হয়ে যাচ্ছে কেন? হঠাৎ কোথা থেকে ট্রামের দুটো আলো এসে ভেঙে একাকার হয়ে গিয়ে খানিক নীহারিকার মতো এমন করে ঘুরপাক খাচ্ছে চার পাশে? আমার মাথার ভেতরে একটা ধারালো করাত চালিয়ে চলেছে কে? কেন এমন করে আমার পাঁজরাগুলো এক সঙ্গে ভেঙে যেতে চাইছে?

মা এসে ডাকলেন: খোকন—

কথা বলতে চাইলুম, পারলুম না। কে এসে গলাটা টিপে ধরেছে। বুকের ভেতরে ভেঙে পড়ছে যন্ত্রণার ঢেউয়ের পরে ঢেউ। মাথা তুলতে চেষ্টা করলুম, কে যেন সেটা চেপে বালিশে নামিয়ে দিলে। ঘরটা এখন যেন গোল হয়ে ঘুরছে। পরিষ্কার শুনতে পেলুম, একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরুচ্ছে আমার গলা দিয়ে—আমি গোঙাচ্ছি!

মা বললেন, খোকন—খোকা—

বলতে চাইলুম, মা—মা গো!—কিন্তু কী বললুম যে জানি না।

মা ছুটে এলেন আমার কাছে। আমাকে নাড়া দিয়ে বললেন, খোকন—খোকন—

অনেক দূর থেকে শুনতে পেলুম ডাকটা। যেন মস্ত একটা অন্ধকার মাঠের ভেতর দিয়ে মা-র সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলুম—কখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছি। আমি মা-র দিকে যত এগোতে চাই, ততই

যেন মা দূরে সরে যান। শুধু ক্ষীণ থেকে আরো ক্ষীণ—আরো ক্ষীণ হয়ে শব্দটা আসে: কী হল খোকন—কী হল তোর?

তারপর সব মুছে গেল।

॥ সাত ॥

তোমারে চাহিনি কভু, অকস্মাৎ তবু তুমি এলে
ডাকিলে অলক্ষ্য-লোকে অকরুণ অঙ্গুলি সংকেতে
মুহূর্তেই জীবনের সব দ্বিধা, সব দ্বন্দ্ব ফেলে
এ শ্রান্ত চেতনা মোর পেলো স্থান তোমার অঙ্কেতে।
তবু দেখি কোথা হতে অতি-ক্ষীণ মৃণাল-বন্ধন
আমারে জড়ায়ে ধরে, বলে: বন্ধু রহ ক্ষণকাল
কান পেতে শোনো তুমি মৃত্তিকার নীরব ক্রন্দন—

কবিতা লিখেছি। এক মাস পরে। মৃত্যুর বন্দনা রচনা করতে চাইছি।

কবিতা যা লিখেছি, সে থাক। টুনটুন যদি শুনতে চায় শোনাবো, কিন্তু ওর হয়তো কষ্ট হবে। আমার অনেক নিঃশব্দ আত্মকথার মতো এ-ও বিন্দুর বন্ধনেই নিজেকে লুকিয়ে রাখুক।

ব্রেলটা নিয়ে আবার বসেছি। কিন্তু ডাক্তারের বারণ, বেশিক্ষণ আমার লেখা চলবে না।

এক মাস। তিরিশ না একত্রিশ দিন? এটা কি মাস? খেয়াল নেই।

কী ভাবেই যে কেটে গেল দিনগুলো! ছেলেবেলায় সেই যে দূত এসে চোখের আলো নিবিয়ে দিয়েছিল, সে-ই আবার নতুনরূপে এসেছিল আমার কাছে। যেন খবর নিতে এসেছিল, অন্ধকারের দৃষ্টি তো আমার তৈরী হয়েই গেছে, এবার আমি নিশ্চিন্ত মনে অসীম তামসীর যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়তে পারি কিনা।

হার্ট-ডিজিজের প্রথম অ্যাটাক। মরণের প্রথম পরোয়ানা।

বিশ্বাস হয় না—কিছুতেই আমার বিশ্বাস হয় না। মাত্র সাতাশ বৎসর আমার বয়েস। অন্ধের পৃথিবীতে আমি বেশ আছি—বেঁচে থাকবার আনন্দ আমার চারপাশে উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত হয়ে পড়ছে। মা-র সেই পদ্মের মতো হাতখানি আছে, টুনটুনের ক'টি অপরূপ আঙুল আছে,—সেতার আছে—আবৃত্তি আছে। আমার ঘরের ফুলদানী থেকে পৃথিবীর বুকের গন্ধ আসে—সকাল-বিকেলে কাকিমা ধূপকাঠি জ্বেলে দিয়ে যান। রেডিয়োতে গান শুনি, 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।' দক্ষিণের হাওয়া আছে, নরম রোদ এসে আমার মুখে পড়ে, একখানা চকচকে নতুন মোহরের মতো (ছেলেবেলায় দেখেছিলুম) আমার বৃত্তাকার স্মৃতির জগৎটুকু ঝকমক করে। আমি বেঁচে আছি—বাঁচতে আমার ভালো লাগে।

এই নিয়েই চন্দ্রা দির সঙ্গে তর্ক করেছিলুম।

বলেছিলুম, আমরাই তো বরং সব চাইতে সুখী। চোখের বাধায় আমাদের মনের ওপর আড়াল পড়ে না; চোখ এক জায়গায় থেমে যায়—মনকে আমরা পাঠাতে পারি যেখানে খুশি—যত দূরে হোক।

চন্দ্রা দি বলেছিল, তুমি কবি, খালি ভালো ভালো কথা সাজিয়ে বলতে পারো।

—কবিতা নয় চন্দ্রা দি। আমি এ কথা জানি, তুমিও এ কথা মানো। আর কবিতা হলেই বা দোষ কী। কবিতা তো মিথ্যে নয়। জীবনের সত্যগুলোকেই সে সুন্দর করে বলে।

চন্দ্রা দি হেসেছিল, বাপ্‌রে। থাক ভাই, তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমি পারব না।

—তর্ক নয়। তুমি তো গান ভালোবাসো? গান কি মিথ্যে?

—মিথ্যে বলব কী করে? গাই যখন।

—গান থেকে যে আনন্দ তুমি পাও, সেটা কিসের? সে-ও জীবনেরই জিনিস। সুরের মধ্য দিয়ে সে আমাদের কাছে সুন্দর আর

সুদূর হয়ে আসে। 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি—' তখন চেনাকেই দেখি—অথচ কী অপরূপ ভাবেই দেখি। তখন আমাদের চোখ বুজে আসে। কেন আসে? চোখের চঞ্চলতা মনের তন্ময়তাকে নষ্ট করে দেয়। আমরা যারা চিরকালের মতো চোখ বুজেছি, আমরা চির-তন্ময়, অপরূপকে আমরা কখনো হারাবো না।

তাই আমার অন্ধতাই আজ সবচেয়ে বড়ো পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারের ভেতর দিয়েই সে অন্ধ বাউলের মতো আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি—এগিয়ে যেতে পারি 'মুক্তধারার' বাঁধ ভাঙতে। আমার অনেক কাজ বাকী। আমি অনেকদিন বাঁচব, আমার স্মৃতি নিয়ে, আনন্দ নিয়ে, অনুভব নিয়ে।

"তারে মোহনমন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ,

তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ—"

সেই আমি মরে যাব? হারিয়ে যাব পৃথিবী থেকে? এত তাড়াতাড়ি আমার সব কাজের পালা ফুরিয়ে গেল! এখুনি মৃত্যুর পরোয়ানা এসে পৌঁছে গেল আমার কাছে? তা হলে চন্দ্রা দির কাছে অত জোর করে দেখিয়েছিলুম কেন?

আমি বিশ্বাস করি না। ডাক্তারেরা বুঝতে পারেনি। আমি মরব না—অনেক, অনেকদিন বাঁচব।

[—খোকন।

মা ডাকলেন। আমি লেখা থামালুম।

—ছাখ, কে এসেছে।

বলেই মা সামলে নিলেন। আমার যে আর দেখবার জো নেই —সে কথাটা এই ষোলো বছরেও মা সম্পূর্ণ যেন বিশ্বাস করতে পারেননি। বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে শক্ত।

নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, তোর ছেলেবেলার সেই মাসিমা এসেছে রে! সেই সঙ্গে এসেছে পুতুল।

রঞ্জার হাসি ভেসে উঠল: পরিচয় করাতে হবে না মাসিমা—

ওটা এনাক্ষী আগেই করিয়ে দিয়েছে। ভালো আছেন তো হিরণবাবু ?

বললুম, হাঁ, এখন ভালোই আছি। আপনি ?

এবার মাসিমা বললেন, ও আবার কী, 'আপনি আপনি' তোরা বলছিস কাকে ? ছেলেবেলায় যে ও মেয়েটা তোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে হাড় জ্বালিয়ে মারত ! ওকে তো 'তুই' বলবি খোকন।

আমি হাসলুম, প্রথমেই অতটা পারব না—অনেক দিন হয়ে গেল তো। সইয়ে সইয়ে নিতে হবে।

রঞ্জা বললে, ঠিক আছে। আমিই চেষ্টা করে দেখছি। জানো হিরণ দা, এনাক্ষী বলে তুমি খুব ভালো কবিতা লেখো।

একটা রোমাঞ্চ বয়ে গেল শরীর দিয়ে। লোভ হল, সঙ্গে সঙ্গে ওকেও 'তুমি' বলে ডাকি। কিন্তু সংকোচ কাটল না। বললুম, টুনটুন একটু বাড়িয়ে বলে সব সময় আমার সম্বন্ধে।

—বাড়িয়ে বলবে কেন ? একদিন শুনব তোমার কবিতা।

একদিন কেন ? আজই তো শুনতে পারে রঞ্জা। আজই তো আমার কবিতা শোনাতে শোনাতে বলতে পারি, জানো, আমার জীবনে —আমার আলোর জগৎটুকুতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই—সেই পাঁচ বছরের তুমি। তোমার অনেক দেখার ভেতরে আমি আর কোথাও নেই—কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমি একব্রত। তাই প্রেমের কবিতা লিখতে গিয়ে মনে মনে যদি তোমাকেই আমি ভেবে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার ক্ষমা কোরো।

কিন্তু আমি কিছু বললুম না—রঞ্জাও নয়। মাসিমা কথা কইছিলেন।

—তোর অসুখের ভেতরে আমরা দু-বার এসে গেছি খোকন। এখন শরীরটা একটু ঠিক হয়েছে তো ?

মনে হল, মাসিমাকে একটা প্রণাম করা উচিত। উঠে দাঁড়িয়ে গলার স্বর অনুমান করে নিচু হলুম, স্পর্শ করলুম পা।

—থাক, থাক বাবা। চিরজীবী হয়ে থাক।

মা'র ভিজে ভিজে স্বর : সেই আশীর্বাদই করো দিদি—যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল আমার।

—না দিদি, ভাববার কিছু নেই। বাবা খোকন, একটু সাবধান হয়ে থাকিস। এখন কোনো পরিশ্রম করা তোর ঠিক নয়।

মাসিমার কথা শুনছি, আর ছেলেবেলাকার সেই ধরে-রাখা টুকরো টুকরো শব্দের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে নিতে চাইছি। কিন্তু মিলছে না। মাঝখানে ষোলোটা বছরের ব্যবধান দাঁড়িয়ে।

আমি নিরুত্তরে হাসলুম কেবল।

মা'র স্বরে অনুযোগ ফুটে বেরুল : বলুন তো—সে কথা কে বোঝায় ছেলেকে ? সময় পেলেই খুট খুট করে লিখতে বসে। বলি, না হয় তুদিন পরেই লিখবি, শরীরটা একটু সেরে উঠুক—কিন্তু শুনছে কে ?

—হিরণ দা, তোমার কবিতা ছাপোনা কেন ?—রঞ্জা যোগ দিলে মাঝখানে।

—ছাপবে কে ?—আমি সেই হাসিটাই টেনে রাখতে চাইলুম মুখের ওপর।

—এনাক্ষী বলে, তোমার কবিতা খুব ভালো। পাঠালেই ছাপবে।

—আচ্ছা দেখব।

কিন্তু এনাক্ষীর কথাই সব ? রঞ্জা কি এখুনি শুনতে পারে না তু-একটা কবিতা ? আমি ভালো লিখি কি মন্দ লিখি, নিজেই তা পারে না যাচাই করে নিতে ? কেবল পরের ওপরেই বরাত দিতে চায় ?

আমার ভাবনার ছায়া রঞ্জার মনের ভেতরে পড়ল না।

—তোমরা কথা বলো মা। আমি যাই ওদিকে, দেখি এনাক্ষী কী করছে।

পায়ের শব্দ বেরিয়ে গেল বাইরে—গোলাপের উগ্র সুরভিটা দূরে

সরে গেল। ওর পায়ের আওয়াজ টুনটুনের মতো লঘু নয়। অনেকখানি বলিষ্ঠতা আর আত্মপ্রত্যয়, অনেক বেশি উচ্ছলতা।

আমার কি আঘাত লাগল ? কিন্তু কোনো তো কারণ নেই তার। কী এমন কৌতূহল রঞ্জার থাকতে পারে আমার সম্পর্কে ? সে আমাকে বলতে গেলে চেনেও না, জানেও না ; যেটুকু সহজ সম্পর্ক তৈরী করে নিয়েছে সে তার নিজ গুণে—টুনটুন বলে, ওর মতো ভালো মেয়ে নাকি বাংলা দেশে দুর্লভ। সেইজন্যেই অসঙ্কোচে ভদ্রতাটুকু করতে পেরেছে।

আমি ? আমি তো একান্তভাবে নিজের গণ্ডীটুকুতেই বাস করছি। তার জগতের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। তা ছাড়া বসন্তে আমি কুরূপ, কুৎসিত হয়ে গেছি, আমার মুখের ওপর ক্ষতচিহ্নগুলো ব্রেলের লেখার মতো কী যেন দুর্বোধ্য ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে গেছে। একটা অসুস্থ, অপরিচিত, অন্য পৃথিবীর মানুষের সান্নিধ্য তার কেন বেশিক্ষণ ভালো লাগবে ? তার কি তা ভালো লাগা উচিত ?

মাসিমা গল্প করছেন মা-র সঙ্গে। আমার চেয়ার টেবিল থেকে একটু দূরে ওঁরা দুটো মোড়া পেতে বসেছেন বুঝতে পারছি। আমার ছেলেবেলার কথাই আলোচনা চলছে। আমি কি রকম ছিলুম দেখতে, কী কী করেছি, কালবোশেখীর ঝড়ে কিভাবে যে আমবাগানে ছুটে বেরিয়ে যেতুম—রাত্রে প্যাঁচা ডাকলে কেমন করে জড়িয়ে ধরতুম মা-কে—কত ভালো ছিলুম লেখাপড়ায়—

মা-র দীর্ঘশ্বাস পড়ছে।

—কত আশাই যে করেছিলুম ভাই! এমন হীরের মতো ছেলে। ভগবান চোখ নিয়েছেন সে দুঃখও সয়েছিলুম, কিন্তু আমার কপালে কী যে আছে এরপর—

মাসিমা সান্ত্বনা দিচ্ছেন : কেন ও-সব ভাবনা ভাই ? অল্প বয়েস। একটু নজর রেখো, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

আমি জানি। আমার কোনো ভাবনা নেই। জীবনের ওপরে

আমার কোনো দাবি এখনো মেটেনি ; আমার অনেক পাওয়া বাকী, অনেক দেখা এখনো শেষ হয়নি। ধ্বনিময়, গন্ধময়, স্পর্শময় জীবন আমার অন্ধকার চেতনার ওপর কত রঙ, কত আলো, কত ছবি ফুটিয়ে তুলবে।

'অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহিরে—'

নিজের ভাবনাতেই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলুম। মাসিমার একটা কথা চকিতে আমায় উৎকর্ণ করে দিলে।

—মেয়ের বিয়ে তো দিতেই চাইছি দিদি। কিন্তু ওঁর জন্যেই তো হচ্ছে না।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

—কর্তার আপত্তি কোথায় ?—মা জানতে চাইছেন।

—আপত্তি আর কিছু নয়—মনের মতো পাত্র মিলছে না।

—সে কি কথা ! আমাদের বস্তির ঘরে সুপাত্রের অভাব ?—মা'র স্বরে কৌতূহল।

—সে আর বলবেন না দিদি। আপনার মতো আমারও তো ওই এক মেয়ে—বাপ আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন। সুপাত্রের আর অভাব কী ? কিন্তু ওঁর অনেক ফ্যাকড়া। জানেন তো আমাদের বৈষ্ণবের বাড়ী. মাছ-মাংস-ডিম কিছু চলে না। উনি বলেন. কোন্ সর্বভুক্ বাড়ীতে পাঠাব—মাছের আঁশ্‌টে গন্ধেই মেয়েটা মরে যাবে। তার ওপর বাঙাল চলবে না, তাদের ভাষা নাকি আমার মেয়ের কানে বন্দুকের গুলির মতো লাগবে। এত বায়নাক্কা মিটিয়ে যদি বা একটি ছেলে পাওয়া গেল, তা-ও ওঁর পছন্দ হল না। দোষের মধ্যে ছেলের রঙ কালো। বলুন তো ভাই, পুরুষ মানুষের গায়ের রঙ দিয়ে কি ধুয়ে খাবে ? উত্তর হল : আমার অমন সুন্দর মেয়ে—বিউটি অ্যাণ্ড্ দি বীস্ট চলবে না।

মা হাসলেন : তবে তো ভারী মুশ্‌কিল।

—মুশকিল বই কি দিদি ! আমিও খুব ঝগড়া করলুম। বললুম,

অতই যদি, তা হলে বিলেত থেকে সায়েব বর নিয়ে এসো, আমাদের বাঙালীর ঘরে জুটবে না। উত্তর হল : আনতুম, কিন্তু ও ব্যাটারা আদত নর-রাক্ষস। আস্তো আস্তো গোরুর ঠ্যাং খায়। আমি ঠিক বলছি দিদি—সারাজীবন মেয়ে থুবড়ো হয়ে থাকবে। বলুন তো, এই দিনকাল—বৈষ্ণব কোথায় পাওয়া যাবে আজকাল ? অত বাছলে চলে না। উনি বলেন, আমাদের গোস্বামী উপাধি আছে জানো তো! আমরা গুরু বংশ। চৌদ্দ পুরুষের ধারা আমি ভাঙতে পারব-না—ছেলে যদি লাটসায়েবও হয়—তবুও না।

মা চুপ করে রইলেন। কিছু একটা ভাবছেন বলে আমার মনে হল। কিন্তু কী ভাবছেন ? সেই ছেলেবেলার কথা ? মাসিমার সেই হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া ঠাট্টাটুকু ? কিন্তু কী করে তা ভাবছেন মা ? আমরা তো বৈষ্ণব নই। পেঁয়াজ রসুন না হলে কাকার তো খাওয়াই হয় না—সপ্তাহে তিনদিন মুরগী আসে বাড়ীতে।

না—আমার এসব ভাবা উচিত নয়। কী ছেলেমানুষি করছি নিজের মনে। আমি কে ? পঙ্গু, অসমর্থ—অসহায়। মাত্র কিছুদিন আগেই মৃত্যুর দূত আমার দরজায় তার সাড়া জানিয়ে গেছে।

না—আমার কোনো দুঃখ হচ্ছে না। কোনো আশা ভঙ্গও হয়নি। যে আলাদা জগতের মধ্যে আমি বাস করছি, সেখানকার দরজা পুতুলকে নিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। রঞ্জা দাশগুপ্ত সে বন্ধ দুয়ার কোনোদিনই খুলতে পারবে না—তার সেখানে ঢোকবার কোনো অর্থই নেই।

তবু কেন জানি না, মেসোমশাইয়ের ওপর আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি। তাঁর এই খুঁতখুঁতুনির জন্যেই হয়তো পুতুলকে আবার নতুন করে পেলুম আমি। নইলে এতদিনে কে এসে তাকে কতদূরে নিয়ে চলে যেত।

অর্গ্যানের সুর ভেসে এল। তারপর সেই বলিষ্ঠ উজ্জ্বল গলায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল মীরার ভজন। অর্গ্যান আছে কাকিমার ঘরে। সেখানে বসেই গান গাইছে রঞ্জা। বৈষ্ণব বলেই বলেই হয়তো মীরার

ভজন ওর এত পছন্দ। টুনটুন শুনেছে, কাকিমা শুনছে, কাকাও আছেন হয়তো।

কিন্তু আমাকে ওরা ডাকেনি। ওদের আসরে আমি কেউ নই। আমার জন্যে কেবল মা আর মাসিমা—আর তাঁদের নিতান্ত বৈষয়িক আলোচনা। ওদের গানের মজলিসে আমার কথা কারুর মনেও পড়ে না; মা আর মাসিমা তাঁদের গল্পের একান্ততায় আমার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। আমি কেউ নই, কারো নই।

তবু টুনটুনও তো অন্তত একটিবার আমার কথা ভাবতে পারত!

আমি দাঁতে দাঁত চাপলুম। এই আমার যেন প্রথম মনে হল, আমার আত্মতৃপ্তির মধ্যে কোথাও ফাঁকা আছে। আমি যেন এইবারে অনুভব করলুম: সংসারে এমন বঞ্চনাও আছে যাকে সহ্য করা শক্ত। না—চন্দ্রা দিকে অনেক কথা কেবল বলবার জন্যেই আমি বলে গেছি, তর্কে জিততে পারিনি।

মাসিমা বলছেন, আমি বলি, তোমার জন্যে শেষে একটা অঘটন ঘটবে। দিনকাল যেমন পড়েছে—এখানকার ছেলেমেয়েদের তো অসাধ্যি কিছু নেই। এখন যে গোঁসাই বংশ বলে নাক উঁচিয়ে বসে আছো, শেষে কোত্থেকে একটা অজাত-কুজাতের হাত ধরে এসে ঢিপ করে তোমার পায়ে প্রণাম করবে, বলবে—বাবা, সিভিল ম্যারেজ করে এলুম, তুমি আমায় আশীর্বাদ করো। এত বাছাবাছি আর লম্বা লম্বা কথা তখন কোথায় থাকবে—শুনি?

—না—না, পুতুল তেমন মেয়ে নয়।—মা আশ্বাস দিতে চাইছেন।

—কে জানে দিদি! ভালো বলেই তো মনে হয়। কিন্তু এই বয়েস আর যা দিনকাল—

আমার কাছ থেকে মাত্র হাত তিনেক দূরে বসে দুই সখী অসংকোচে মনের কথা বলছেন। আমার জন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই—কোনো লক্ষ্যও আছে কিনা সন্দেহ। আমি এই বাড়ী শুদ্ধ সকলের কাছেই নিছক একটা জড়-পদার্থ। একটা পাথরের ধারে কিংবা কোনো গাছের তলায়

বসে গোপন কথা বলতে গেলে গাছের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কারো সচেতন থাকার দরকার হয় না, আমার ব্যাপারটাও ঠিক তাই।

সুখে আছি আমি? কী নির্বোধ—কী নিদারুণ নির্বোধ।

আর ওদিক থেকে ভেসে আসছে লহরে লহরে রঞ্জার গান:

"মীরা কী প্রভু গিরিধর নাগর
বিখ্ সে অমৃত্ করে—"

কিন্তু ওখানে তো টুনটুন ছিল। সে-ও তো আমায় ডেকে নিয়ে যেতে পারত ওদের গানের আসরে। বলতে পারত, সোনা দা, তুমি ওখানে অমন চুপটি করে বসে আছো কেন? চলো—চলো, আমাদের ঘরে গিয়ে বসবে—শুনবে রঞ্জা দির গান।

অথচ আমার কথা ওর একবারও মনে পড়ল না। আর ওর কাছেই আমি খুঁজতুম শান্তি আর সান্ত্বনা—ও এসে কবিতা শোনাতো আমাকে —শোনাতো সেতার—ছোট বোন হলেও ওকে আমি ছোট মা বলেই ভেবেছি এতকাল।

আমার কেউ নেই। আমি একা।

আচ্ছা—আমি আবার দাঁতের ওপর দাঁত চাপিয়ে দিলুম: রঞ্জাও যদি অন্ধ হয়ে যেত, তা হলে? যে চোখের খুশিতে আর গৌরবে সে এখন এমন ভাবে হরিণের মতো জীবনের বসন্তের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে, সেখানে যদি হঠাৎ দেখা দেয় কোনো ব্যাধের বাণ—কোনো একটা পুরোনো ইঁদারার কালো অতল থেকে উঠে আসে চোখ ছিনিয়ে নেওয়া শয়তানের সেই দুটো চোখ? কিছু বলা যায় না—কেউ বলতে পারে না। এখনো রঞ্জার টাইফয়েড হতে পারে, স্মল পক্স দেখা দিতে পারে—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কী ভাবছি আমি? পাগল হয়ে গেছি নাকি? অন্ধ আমি হতে পারি, তাই বলে জানোয়ার তো নই! কোথা থেকে এমন কদর্য চিন্তা আমার মনে এল!

আমার নিঃসঙ্গতাই আমার গৌরব। সেই আমার অহঙ্কার। আমি

সেখানে সম্রাট হয়ে বসে আছি—কে আমাকে সেখানে স্পর্শ করে? আমি সেই স্তেপ ঈগল—হিমালয়ের ব্লিজার্ডের মধ্যে দিয়ে নির্ভীক ডানায় যার একক যাত্রা। আমি একাই চলব।

"The lone climber—snowy peaks ahead—"

কিন্তু গানটাকে তবু ভোলা যাচ্ছে না। স্তেপ ঈগলকে সে পিছু টানছে ক্রমাগত।

মীরা কী প্রভু গিরিধর নাগর—

॥ আট ॥

আমি কিছুতেই যেতে চাইনি। বললুম, আমাকে আর কেন টানাটানি করছ মা? তোমরা যাবে যাও—আমি ঘরেই বেশ আছি।

মা রাগ করলেন।

—একি কুনো অভ্যেস হল তোর? আগে তো এমন ছিলি না। টুনটুনের সঙ্গে তবু মাঝে মাঝে পার্কে বেড়াতে যেতিস। এখন যে ঘরের কোণা ছেড়ে নড়তেই চাসনে।

—আমার ভালো লাগে না।

মা বললেন, ভালো তবে লাগে কী, শুনি? ওই যন্তরটা নিয়ে খুটুর-খাটুর করতে? দেব ওটা আমি রাস্তায় ফেলে।

আমি হেসে বললুম, ও ভয় তুমি আগেও অনেকবার দেখিয়েছ, কিন্তু ওটা ফেলতে পারোনি। সত্যি বলছি মা—তোমরা যাও—আমাকে একলা থাকতে দাও।

—ডাক্তার যে তোকে খোলা হাওয়ায় বেড়াতে বলেছে।

—সেই খোলা হাওয়া বুঝি তোমার সইয়ের বাড়ী?

মা এবার হেসে ফেললেন বুঝতে পারলুম। তারপরেই আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন।

—না দ্যাখ, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। ওরা চার-পাঁচদিন এল-গেল, আমাদেরও এক-আধদিন না গেলে ভালো দেখায় ? কী ভাববে ওরা ? আজই দুপুরে সই টেলিফোন করছিল যাবার জন্যে। চল্ বাবা !

—টুনটুনকে নিয়ে যাও।

—কেন জ্বালাচ্ছিস খোকন ? টুনটুন তো মামারবাড়ী গেছে কোন্নগরে।

তা বটে ! কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম। কিসের জন্যে যেন ওদের কলেজ ছুটি আছে তিন-চারদিন। কাল ওর মামা-মামীরা এসেছিলেন। তাঁরা জোর করে টুনটুনকে দু'দিনের জন্যে ধরে নিয়ে গেছেন।

মা আবার বললেন, বিশুকে নিয়ে যেতুম (বিশু আমার খুড়তুতো ভাই —ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে)—কিন্তু সে আবার গেল কোথায় টেবিল টেনিস খেল্‌তে, ওর নাকি কম্পিটিশন আছে। তুই চল্ সঙ্গে। ওরাও খুশি হবে।

—তোমার অন্ধ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কি করবে মা ? আমি তো তোমায় কোনো সাহায্য করতে পারব না—কেবল বোঝাই বাড়াবো।

মা একটু চুপ করে রইলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলুম।

—তুই জানিস এই কথাটায় আমি সব চাইতে দুঃখ পাই। সব সময় কথাটা কি তোর না বললেই নয় ?

আমার অনুতাপ হল।

—চলো মা, যাচ্ছি।

ট্যাক্সিতে রওনা হলুম মার সঙ্গে। একডালিয়া রোড থেকে পার্ক সার্কাস। কতটা পথ জানি না। আমি শুনেছি কলকাতা যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। ট্রামে-বাসে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীতে লাখো লাখো মানুষে সে এক বিপর্যয় কাণ্ড। আমি তার কিছুই জানি না—যখন আমার চোখ ছিল, তখন কলকাতা আমি দেখিনি। কিন্তু শ্রুতিতে, ধ্বনিতে—অনুভবে আমি বুঝতে পারি। ট্রামের শব্দ চিনি, জানি বাসের আওয়াজ—যখন লরী যাচ্ছে আন্দাজ করতে পারি। জানি

ঠেলাগাড়ির চাকার ছন্দ ; ডবল-ডেকার বাসের মাটি কাঁপানো ভৈরব উল্লাস বুঝতে আমার দেরী হয় না ; গাড়িতে বসেও টের পাই, কোন্ পথে ভিড়, কোন পথ লোকারণ্য।

মনে হচ্ছে, একটা ফাঁকা চওড়া রাস্তা দিয়ে চলেছি। অফুরন্ত হাওয়ার উচ্ছ্বাস আসছে গায়ে—রাস্তার ধারে সারি সারি গাছে পাতায় পাতায় তুফান উঠছে বোধ হচ্ছে। শরৎ আসছে মনে হয়। গড়াই নদীর চরে এই সময় কত কাশ ফুটত—মাইলের পর মাইল বনঝাউ আর কাশ মেশামেশি করে যেন অসীমের সমুদ্র রচনা করত। আমাদের বাগানটা যেন একাকার হয়ে থাকত শিউলীতে। আশেপাশে কোথাও নিশ্চয় শিউলি গাছ আছে—বাতাসে তার নতুন কুঁড়ির শিহরণ টের পাচ্ছি।

কী ভাবছিলুম ? ছেলেবেলার দিনগুলো ?—না ঠিক তাও নয়। মনে হচ্ছিল আজ তো আমি সকলের বাইরে। কাকা ওকালতী পাশ করতে বলেছিলেন, সেটা করলেও আমার কিছু না কিছু ভূমিকা ছিল। কিন্তু ওখানেও তো কিছুতেই নিজের উৎসাহটাকে জাগাতে পারলুম না। সকলের, সব কাজের থেকে আমি দূরে, নিঃসঙ্গতার রাজ্যে সম্রাট, ব্লিজার্ডের সঙ্গে লড়াই করে উড়ে-চলা একাকী ঈগল। মা কেন সেই আমাকে রঞ্জাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে চান ? আরো বিশেষ করে যে-আমার নিতান্তই খেলার পুতুল নিয়ে কারবার—নানা রঙের কৃপণ আলোয় সেই পুতুল নিয়ে নাড়াচাড়া করেই যে-আমার দিন কাটে ?

মাঝখানে একদিন একটু ক্ষোভ জেগেছিল ; কিছুক্ষণের জন্যে তীব্র তিক্ততায় ভেবেছিলুম—যতই আত্মপ্রসাদ নিয়ে বসে থাকি না কেন, পৃথিবী আমায় কখনো কখনো কী নির্মমভাবেই বঞ্চনা করেছে। কিন্তু এখন আর কোনো নালিশ নেই কারো ওপর। আমি নিশ্চিন্ত, আমি নিরুত্তেজ।

মা অবশ্য কেবল আমার ভরসাতেই আসেননি, বাড়ীর ছোকরা

চাকর জনার্দনকেও এনেছিলেন। জনার্দনই হঠাৎ একসময় চেঁচিয়ে উঠল: রোখো—রোখো—এই যে বাঁয়ে বাড়ী।

গাড়ী আস্তে আস্তে একটা কম্পাউণ্ডে ঢুকল টের পাচ্ছি। চাকার নীচে পিচ নয়—কাঁকরের আওয়াজ উঠছে। একটা বাগান আছে নিশ্চয়—বাতাসে লতাপাতা, অর্কিড আর অজানা ফুলের চাপা গন্ধ।

—এই যে দিদি, আসুন—আসুন।—মাসিমার সম্ভাষণ: পুতুল —তোর মাসিমা এসেছে।

মা'র হাত ধরে নামলুম গাড়ী থেকে।

রঞ্জা ছুটে এসেছে: এনাক্ষী আসেনি?

মা বললেন, না—সে মামারবাড়ী গেছে।

রঞ্জা নিরাশ হল, তা আমি বুঝতে পারছি; কিন্তু আমি এসেছি বলেও কি সে এতটুকু খুশি হয়নি?

মাসিমা বলছেন, চলুন দিদি—চলুন।

একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি। দুধারে অর্কিডের উপস্থিতি আমার স্নায়ুকে চকিত করছে। মনে হচ্ছে হাত বাড়িয়ে দিলেই কোথাও এক গুচ্ছ ফুলকে আমি স্পর্শ করতে পারব। উগ্র-সুরভিত একরাশ গোলাপ।

পায়ের তলায় কার্পেট। বসবার ঘর। মা বলছেন, বেশ বাড়ীটি হয়েছে ভাই।

মা আমাকে একটা সোফায় বসিয়েছেন। আমার পাশেই মা। মাসিমাও বসেছেন মুখোমুখি। রঞ্জাও ঘরে আছে—তার কথা শুনছি না—উপস্থিতিটা অনুভব করছি।

মাসিমা বলছেন: এ বাড়ীর আশা তো আমরা ছেড়েই দিয়েছিলুম। সেই দাঙ্গার সময়—জানেন তো? ভাড়াটে পালালো—পোড়ো হয়ে রইল প্রায় দু-বছর। উনি তো বলেছিলেন যে দাম পাই বেচেই দিই। কিন্তু আমি বাধা দিলুম, বললুম, থাকে থাক যায় যাক, এত সাধ করে করা বাড়ী প্রাণে ধরে বেচতে পারব না। এখন উনিই বলছেন, ভাগ্যিস

তোমার কথায় বাড়ীটা রেখেছিলুম, নইলে আজ তো আর মাথা গোঁজবার জায়গা জুটত না।

—এনাক্ষী এল না? ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে।—রঞ্জার অনুযোগ শোনা গেল এবার।

কাকার চাইতেও ভারী পায়ের আওয়াজ, তাঁর চাইতেও মোটা গলা নিয়ে মেসোমশাই ঢুকলেন।

—এই যে বৌদি, নমস্কার।

—নমস্কার। খোকন, তোর মেসোমশাই এসেছেন।

উঠে প্রণাম করতে গেলুম, দু-খানা চওড়া হাত আমায় আবার বসিয়ে দিলে সোফায়।

—গৌর—গৌর। এমনিই আশীর্বাদ করছি বাবা। তোমার অসুখের কথা শুনেছিলুম—তা এখন বেশ ভালো আছো তো?

—আজ্ঞে হাঁ, ভালোই আছি।

তারপরেই আমার আর কোনো দরকার রইল না। সংসারের আলাপ, অতীতের স্মৃতি-মন্থন, মাসিমার বাতের কাহিনী, আমাকে নিয়ে মা-র দুশ্চিন্তার ইতিহাস। আর শেষে রঞ্জার বিয়ের কথা।

—আপনিই বলুন তো বৌদি—যেখানে হোক মেয়েটাকে আপদ বিদায় করলেই হল? একটা মাত্র মেয়ে আমার—দুম্ করে তুলে দেব যার-তার হাতে? বয়েসও তো এমন কিছু হয়নি। আমি বলি এম এ-টা পাস করুক, তারপর—

রঞ্জা এতক্ষণ আলাপের ভেতরে টুকটাক করে নিজের কথা জুড়ে দিচ্ছিল, আমি বুঝতে পারলুম, এইবার ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। তারপরে ঠিক আমার পাশেই ওর নীচু গলা শুনতে পেলুম।

—চলো হিরণ দা, আমার পড়ার ঘরে। এখানে বুড়োবুড়ীরা সুখ-দুঃখের গল্প করুক।

মাসিমা হাসলেন: বিয়ের কথা উঠলেই পালায়! যা খোকন—তুই ওর সঙ্গেই যা।

লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। জানি, আমি টুনটুনের বিকল্প—আমার জন্যে রঞ্জার আলাদা কোনো পক্ষপাত নেই। মনের মধ্যে একটা প্রতিবাদ গজরে উঠল একবার—কিন্তু রঞ্জা আমার হাত ধরেছে। মা নয়—টুনটুন নয়—আর এক স্পর্শ। আমার রক্তের ভেতরে ঝিন ঝিন করে উঠল।

আমি এগিয়ে চললুম। যেন নিজের ভাগ্য আমাকে নিয়ে চলেছে। আর কী অপরূপ মাদকতা জাগছে শরীরে—সেই হাতের ছোঁয়ায় আমার নিরালোক চেতনার মধ্যে যেন একটির পর একটি আলোর বিদ্যুৎ ছুটে চলেছে। এমনি করে সারাটা জীবন যদি কেউ আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেত, তা হলে—

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পা ফেলছিলুম—যেন নীচে মাটি ছিল না, যেন মেঘের ভেতরে ভেসে চলেছিলুম খানিকক্ষণ। তারপর রঞ্জা বললে, বসো।

একটা চেয়ার। হাত বাড়াতে টেবিল আর বইয়ের স্পর্শ। রঞ্জার পড়বার ঘর। বইগুলোর ওপর আমি হাত বুলিয়ে নিলুম। যদি ব্রেলে লেখা হত, আমি পড়তে পারতুম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। গোলাপগুচ্ছের গন্ধে যেন নেশা ধরছে একটু একটু করে। আমার অন্ধত্বের অহমিকার কথাটা ভুলে গেছি এখন। ভাবছি, এমনি করে ওর মুখোমুখি আমি এক ভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারি, দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—

তারপরেই সজাগ হয়ে উঠলুম। আমি যে টুনটুনের বিকল্প—গোলাপের একটা ছোট কাঁটা হয়ে সেইটে আমাকে বিঁধল। সৌজন্যের আলাপ শুরু করে দিলুম।

—কী নিয়ে এম, এ, পড়ছ ?

—হিস্ট্রি।

—এন্‌শেন্ট না মডার্ণ ?

—মডার্ণ।

—পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট খুব ভালো লাগে ?

—মন্দ কী ! পড়তে চাইলে পৃথিবীর সমস্ত দরজা খোলা—পড়তে না চাইলে একেবারে অবাধ স্বাধীনতা।

—তুমি কোন্‌টা বেছে নিয়েছ ?

রঞ্জা হাসল : মাঝামাঝি রাস্তা। যতই চেষ্টা করি না কেন, আমার মেরিট নিয়ে কোনো দিনই ফার্স্ট ক্লাস পাবো না। কাজেই সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বসে চশমার পাওয়ার বাড়াতে আর ইচ্ছে করে না। তবে মোটামুটি একটা সেকেণ্ড্‌ ক্লাস না পেলেও তো চলবে না—সেটাও দেখতে হয়।

কিন্তু কী স্থূল—কী বৈষয়িক আলোচনার মধ্যে সময় কাটাচ্ছি আমরা। কোনো দরকার আছে এর ? রঞ্জার মনের খবর জানি না, আসলে আমিই যেন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। একটা কৃত্রিম স্বাভাবিকতা সৃষ্টি করতে চাইছি শুধু।

রঞ্জা হঠাৎ বললে, জানো হিরণ দা, তোমার কবিতার কিছু কিছু লাইন আমি মুখস্থ বলতে পারি।

দারুণ চমকে উঠলুম।

—আমার কবিতার লাইন ! তুমি পেলে কোথায় ?

—বাড়ীতে যে তোমার মুগ্ধ ভক্তটি বসে আছে—তার কথা ভুলে গেলে ? এনাক্ষীর মুখে বার বার শুনতে শুনতে আমার ডাল-মেমোরিতে পর্যন্ত ধরা পড়ে গেছে। বিশ্বাস হচ্ছে না ? শোনো :

> তারপরে কবে দেখেছি তোমারে হে মোর চিত্রলেখা,
> শিপ্রা-সলিলে ফেলিয়াছে ছায়া সে কোন্‌ উজ্জয়িনী,
> মণি-মরকত খচিত কোথায় মর্মর শিলাতলে,
> কবরী বাঁধিছ শ্রেষ্ঠীকন্যা অগুরুর ধূপাধারে।
> রাশি রাশি ফুলে যেথায় ভরেছে সপ্তপর্ণী শাখা,
> টলোমলো করে কানায় কানায় মরাল-দীঘির জল—

—থাক, থাক।—আমি লজ্জা পেলুম : টুনটুনের এ ভারী অন্যায়।

—অন্যায় কেন ?—রঞ্জা হাসল : ওর সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে তুমি নিয়মিত লিখলে কবি হিসেবে নাম করতে পারবে।

বললুম, এ কবিতা আজকের দিনে অচল। এই ভাষা, এই ছন্দ, এ সব কবিতা এখনকার পাঠকের ভালো লাগে না।

—সব কালেই সব রকম পাঠক আছে, কোনোদিনই পাঠকের বিশেষ কোনো চেহারা নেই। দেখতেই পাচ্ছ, এ যুগেই তোমার মুগ্ধ পাঠিকা রয়েছে এনাক্ষী—আর আমাকেও প্রায় দলে টেনে ফেলেছে।

—ঘরের লোকের দেওয়া মানপত্রের ওপর বেশি বিশ্বাস করতে নেই।

—বিনয়ে তোমার সঙ্গে পারা যাবে না।—রঞ্জা হাসল : সত্যিই তোমার কবিতার হাত ভারী মিষ্টি। পড়তে পড়তে কালিদাস মনে আসে।

বললুম, তার কারণ ছবিটা আগাগোড়া কালিদাস থেকে চুরি।

—এটা তর্ক। কল্‌হন না কার একটা শ্লোকে পড়েছিলুম, 'পরকাব্যেষু কবয়ঃ'। সব কবিই অন্যের কাছ থেকে প্রেরণা নেন, একজনের বীজ কুড়িয়ে নিয়ে আর একজন ফুলের ফসল ফলান। কিন্তু এসব তত্ত্ব আলোচনা থাক। একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমায় ? এর আগেও কয়েকবার মনে হয়েছে, কিন্তু বলতে—

—কিছু না—কিছু না, বলো।

—তোমার এসব কবিতার কি সবটাই ইম্‌পার্সোনাল ?

আমি একটুখানি চকিত হয়ে উঠলুম : তার মানে ?

—বলছি। —রঞ্জা একবার ইতস্তত করল : যে চিত্রলেখার কথা কবিতায় তুমি বলেছ, সে কি শুধুই একটা রোমান্টিক্ স্বপ্ন ? নিছক কালিদাসের কাব্য থেকেই সে বেরিয়ে এসেছে ? জীবনে কোথাও কি তার এতটুকু মূল ছিল না ? এমন একটা বিন্দু কি কোথাও নেই—যাকে আশ্রয় করে কবিতার মুক্তোটা গড়ে উঠতে থাকে ?

আমার বুকে তুফান উঠল, মাথায় ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল রক্ত। কী করে জানতে পারল রঞ্জা? কেমন করে বুঝল আমার সেই স্মৃতির বৃন্তের ভেতর থেকে, চার বছরের পুতুলের সেই ছোট অঙ্কুরটিকে দিনের পর দিন লালন করেছি আমি? কী করে অনুমান করল: যে তরুণী মেয়ের দেহকান্তির কোনো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আমার নেই, কালিদাসের কবিতা দিয়ে সেই অভাব আমি পূরণ করেছি—আর তিলে তিলে যে তিলোত্তমা চিত্রলেখাকে গড়ে নিয়েছি, সে—

রঞ্জা বললে, অবশ্য এ শুধুই কৌতূহল। কবিকে তার জীবন-চরিতে খুঁজে পাওয়া যায় না, একথা রবীন্দ্রনাথ বলে দিয়েছেন। তবু আমরা যারা কবি নই, আমাদের জানতে ইচ্ছে করে ইন্‌স্‌পিরেশন কি মন থেকে আপনি আসে, না বাইরেও তার একটা 'সোর্স' দরকার হয়?

নিজের হৃৎপিণ্ডের চঞ্চল স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি, রঞ্জাও শুনছে কিনা জানি না। বলব? এতদিনের সমস্ত নীরব সাধনার অর্ঘ্য ঢেলে দেব ওর পায়ে? আজ সব সংকোচের আড়াল সরিয়ে দিয়ে ওকে জানাবো: আমার প্রেরণার সেই উৎস তুমিই—তুমি ছাড়া আর কেউই নয়? তোমাকে আমি দেখিনি—চিনি না—জানি না। তুমি সুন্দর, একথা সবাই বলে। কিন্তু সকলের দেখা সেই রূপের সঙ্গে আমার ভাবনার কোনো মিল নেই। আমি তোমাকে আমার জন্যে নতুন করে সৃষ্টি করে নিয়েছি। কালিদাসের কাব্য থেকে হোক আর ইংরেজি কবিতার স্বপ্ন থেকেই হোক—তোমার এক আলাদা ধ্যানরূপ আমি গড়ে রেখেছি নিজের হাতে, যেমন করে পিগ্‌ম্যালিয়ন শাদা পাথরের বুকে খোদাই করে নিজের মানসী মূর্তিকে রূপ দিয়েছিল।

আমি হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, হয়তো কোনো কথাই আমার ঠোঁটের সীমানা পেরুতে পারত না। ঠিক সেই সময় মাসিমার ডাক ভেসে এল: ওরে পুতুল, খোকনকে নিয়ে আয় এ ঘরে। তোর মাসিমা গান শুনতে চাইছে।

রঞ্জা বললে, দেখলে তো? তোমার সঙ্গে একটু যে কাব্য চর্চা

করব, তারও জো নেই। নেহাত মাসিমা শুনতে চেয়েছেন, নইলে আমি বিদ্রোহ করতুম। চলো এখন ও-ঘরে। পরে এক সময় কবিতা নিয়ে বোঝাপড়া করা যাবে তোমার সঙ্গে।

আমি চেয়ারটা থেকে উঠে দাঁড়ালুম। তারপরে একটু বেরিয়েই কেমন করে জানি না, টেবিলের একটা পায়া হোক কিংবা আর কিছু হোক—তার সঙ্গে আমার হোঁচট লাগল—মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল আমার।

—আহা—আহা—

রঞ্জা দু হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। শাড়ী, সুগন্ধ আর মেঘের ফেনার মতো একটা নরম শরীর এক মুহূর্তে আমাকে যেন নিশ্চিহ্ন করে নিলে। এই কি আমার মৃত্যু? আমার নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়া—ফুরিয়ে যাওয়ার এই কী লগ্ন? একটি মিনিটের মধ্যে যেন যুগ-যুগান্ত পার হয়ে গেল।

পরক্ষণেই আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু তখনো থর থর করে কাঁপছি!

রঞ্জা শক্ত করে আমার হাত ধরল। লজ্জায় জড়ানো, কাঁপন-লাগা মৃদু গলায়, দ্রুত ভীত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে জানতে চাইল: লাগল হিরণ দা—লাগল তোমার?

—না—না।

আমার গলা কি শুনতে পেলো রঞ্জা? বুঝতে পারলুম না।

॥ নয় ॥

সাত আটদিন কিছু আর লেখা হয়নি।

কেন যে হয়নি, নিজের কাছে সে কথা আর লুকোনো নেই। আমি কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছি না। আমার সব লেখা—সব

ভাবনা—সেই মেঘের ফেনার মতো শরীরের অনুভবে, সেই সুগন্ধির ঘূর্ণির মাঝখানে হারিয়ে যাচ্ছে। আমার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন এখনো নেশায় টলছে। একটা তীব্র সুখ, তারো চেয়ে তীব্র বেদনা আমাকে যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।

কিন্তু এ আমি কী করছি? এ কোন্ অর্থহীন পাগলামো আমাকে পেয়ে বসল? একজন অন্ধ মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল—একটি করুণাময়ী মেয়ে তাকে রক্ষা করেছে সেই সংকট মুহূর্তে। আমি তার সেই করুণাকে এ কোন দিক থেকে দেখছি? আমার মন কামনা করছে, এমনি করে আবার হোঁচট খেয়ে পড়ব, আবার ছু-খানি নিটোল কোমল হাত সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, নরম ফেনার মতো বুকের মধ্যে টেনে নেবে আমাকে। ছি ছি, এ আমার কী হল?

তবু কিছুতেই ভুলতে পারছি না; মা'র ছোঁয়া নয়—যে সমস্ত ক্লান্ত দেহমনকে অতল বিশ্রামের ভেতরে মগ্ন করে দেবে; আমার ছোট বোন হয়েও যে ছোট্ট মা—সেই টুনটুনের মমতাও তাতে নেই। তবে কী আছে? জানি না। এ স্বাদ জীবনে আমি কখনো পাইনি।

কখনোই আর পাবো না!

ভাবতেই কেমন একটা যন্ত্রণা এসে বুকের সব নাড়ীগুলোকে ধরে যেন হিংস্রভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। আমি প্রাণপণে ভুলতে চাই। বলি—রঞ্জা তোমার কেউ নয়, যে নিরালোক নির্বাসনে তুমি বাস করছ, সেখানে তার পা কোনোদিন পড়বে না। তার চেয়ে যা পেয়েছো, তাই নিয়েই খুশি হও। চন্দ্রা দি কখনো আলো দেখেনি, অন্ধ-নিকেতনে তার মতো আরো অনেককে তুমি দেখেছ, যারা একটি রঙকেও কোনো-দিন দেখবার সুযোগ পেলো না। তোমার এই গোল-টেবিলের মতো স্মৃতির বৃত্তটা রয়েছে—ষোলো বছরের কালো দীর্ঘ নলটার ভেতর দিয়ে সেই দিনগুলোকে তুমি তো আশ্চর্য উজ্জ্বলতায় দেখতে পাও। তোমার তো কিছুই হারায়নি। সেই গড়াই নদী—ভালো নাম হয়তো গৌরী—সে তেমনি বয়ে চলেছে সেখান দিয়ে, সকাল-সন্ধ্যায়-রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে

রঙ বদলাচ্ছে ; সেই বকেরা এখনো মাছ ধরতে ধরতে আর পালক খুঁটতে এক-আধবার শুনে নিচ্ছে তোমার ডাক : 'বক মামা, বক মামা—পান খেয়ে যা।' দেখতে পাচ্ছ খেয়া-নৌকোর যাওয়া-আসা, চরের ওপারে কালো কালো কতগুলো পুতুলের মতো বাঁক কাঁধে মানুষগুলোর কোন্ দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া ; তোমার চোখের সামনে চেনা পাখিরা তেমনি করেই উড়ে যাচ্ছে, ভাঁটফুল দুলছে—চাঁপা ফুটছে, সন্ধ্যার তারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লক্ষ কোটি জোনাকি জ্বলছে। আর আছে সেই পুতুল—যে পুতুলকে রঞ্জা আর চেনে না, তার মা'ও হয়তো ভুলে গেছে। সেখানে তোমার অধিকার 'None to dispute !' তার বেশি কেন চাও—তার বেশি কেন করো অনধিকার চর্চা ?

আমি তাই নিয়েই থাকব। সেই ক্ষণস্পর্শের মোহ আমার দূর হোক। রঞ্জার করুণাকে আমার লোভ দিয়ে যেন আমি অপমান না করি। আমার সীমানার ভেতরেই পরিক্রমা করব, তার বাইরে কিছুতেই যাব না।

[টুনটুন এল।

—সোনা দা ?

—কিরে ?

টুনটুন সেই মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল। ও ছোট একটি মানুষ, বসলে ওকে আরো কত ছোট দেখায়, তা আমার জানতে ইচ্ছে করে।

—কী লিখছিলে সোনা দা ?

—কিছু নয় বিশেষ। এম্‌নি এলোমেলো লেখা।

—নতুন কবিতা লেখোনি কিছু ? শোনাও না। অনেকদিন তোমার কবিতা শুনিনি।

লিখেছিলুম ক'দিন আগে—সেই মৃত্যুর বন্দনা। কিন্তু সে কবিতার কথা টুনটুনকে বলতে ইচ্ছে করে না, আমিও যেন সেটাকে ভুলে যেতেই চাই। চন্দ্রা দিকে জোরের সঙ্গে বলেছিলুম, জীবনকে আমি ভালোবাসি, আমি বাঁচতে চাই। তারপর কখনো কখনো দার্শনিক হয়ে উঠেছি,

কখনো কখনো মনে হয়েছে, আমার সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন ভাবি, আমি তো আবার দাঁড়াতে পারি—আবার নতুন একটা কিছু আরম্ভ করতে পারি। হেলেন কেলারকে জানি—পৃথিবী জোড়া নাম কিনেছিলেন। আমি কেন ছাব্বিশ বছর বয়সেই প্রাজ্ঞতা আর বৈরাগ্যের চূড়োয় উঠে বসে থাকব ?

টুনটুন জিজ্ঞেস করল, চুপ করে আছো যে সোনা দা ? শোনাবে না কবিতা ?

—নতুন কিছু লিখিনি এখনো।

—জানো, রঞ্জা দি তোমার খুব প্রশংসা করছিল।

আমার হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হয়ে উঠল। যে স্মৃতির সাম্রাজ্যে বসেছিলুম, সেখানে থেকে চক্ষের পলকে আবার সেই অসম্ভব দুরাশার জগতে নেমে এলুম। প্রাণপণে আত্ম-সংযম করে বললুম, কেন প্রশংসা করছিল ? আমার কী এমন অসাধারণ গুণের পরিচয় পেলো সে ?

—তোমার কবিতা ওর ভীষণ ভালো লেগেছে। বলে, ভারী মিষ্টি হাত।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার আমি আত্ম-সংবরণ করলুম, তারপর বললুম, তোর ভারী অন্যায় টুনটুন। কেন তুই আমার কবিতা শোনাতে গেলি রঞ্জাকে ?

টুনটুন দুষ্টুমির হাসি হেসে উঠল : বেশ করেছি। কবিতা তো কবির একার নয়—সংসারের সকলের জন্যে।

—না, আমার কবিতা আমার নিজের। তোকে শুনিয়েই আমি ভুল করেছি।

টুনটুন আবার হাসল : ভুল যখন করেইছো, তখন তার তো আর চাড়া নেই। রঞ্জা দি আরো কী বলেছে জানো ? ওর জানা-শোনা এক ভদ্রলোক 'নতুন আকাশ' পত্রিকাটার সম্পাদক। তুমি যদি কবিতা দাও—তাইতে ছেপে দেবে।

—ছাপবে না। বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবে।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে এখন। রঞ্জা দি হয়তো নিজেই কবিতা চাইতে আসবে তোমার কাছে।

—এলেই দিচ্ছি কিনা!—রঞ্জা আসবে! আমার বুকের স্পন্দন কি টুনটুন শুনতে পাচ্ছে?

—ঠিক আদায় করে নেবে—দেখো।

আমি আবার চুপ করে রইলুম। তারপর: আচ্ছা, টুনটুন—

—কী বলছ?

—কাকা প্রায়ই বলেন, আমাকে ল-ক্লাসে ভর্তি হতে। হয়ে যাবো?

—সে তো ভালোই!—টুনটুনের মায়ের মতো গলা মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল: কিন্তু তুমি যে আবার শরীরটাকে খারাপ করে বসে আছো। অত স্ট্রেন তোমার সইবে কেন?

—কিছু না—আমি ঠিক হয়ে গেছি, আচ্ছা, তোর কী মনে হয় টুনটুন? আমি ভালো রেজালট্ করতে পারব ল-তে? কাকার মতো বড়ো এ্যাড্‌ভোকেট হতে পারব?

—কেন পারবে না? ইচ্ছে করলে তুমি তো ব্যারিস্টারও হতে পারো সোনা দা—! কল্পনাতেই টুনটুন উত্তেজিত হয়ে উঠল: উঃ, তুমি ব্যারিস্টার হলে যে কী মজাই হবে! আমি তোমার হাত ধরে কোর্টে নিয়ে যাবো, তুমি আর্গুমেণ্ট করবে, আমি বসে বসে শুনব। আর তুমি যে পক্ষ নেবে, তারা কোনোদিনই হারবে না।

এই হল টুনটুনের মতো কথা। আমার ছোট্ট মায়ের কথা।

আমি হাসলুম: এ সব ভাবতে তো ভালোই, কিন্তু তোকে আর তখন আমি পাচ্ছি কোথায়? ততদিনে তুই কবে একখানা টুকটুকে লাল শাড়ী পরে, কার একটা ময়ূরপঙ্খী মোটরে চেপে শ্বশুরবাড়ীতে চলে গেছিস।

—ছিঃ সোনা দা, ও সব বোলো না।—টুনটুন লজ্জা পাচ্ছে।

—কেন বলব না? কথাটা তো সত্যি।

—কক্ষণো সত্যি নয়। আমি বিয়ে করলে তো?

—হুঁ, মুখে ও-রকম সবাই বলে। কালকে কাকা একটি পাত্র জুটিয়ে আনুন—আর তোর তর সইবে না, তক্ষুণি গিয়ে পিঁড়েতে বসে পড়বি।

—আর আসব না তোমার কাছে—

টুনটুন উঠে পড়ল, ছুটে পালালো ঘর থেকে।

ওর পালিয়ে যাওয়ার সেই লঘু মুহূর্তটির আবেশ মনের মধ্যে মাখিয়ে নিয়ে, আর রঞ্জা আমার কবিতা চাইতে আসবে, এই সম্ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে আমি কল্পনার ছবি আঁকতে লাগলুম। আমি ল' পাস করেছি, অ্যাড্‌ভোকেট হয়েছি, হাইকোর্টে বেরুচ্ছি কাকার সঙ্গে। কাকা বলেন, খুব নাম করছে খোকন, এরপরে ও আমায় ছাড়িয়ে যাবে। আর ওদিকে রঞ্জার এখনো বিয়ে হয়নি। বৈষ্ণব, অবাঙাল এবং সর্বরূপগুণান্বিত পাত্রটি বাংলা দেশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি তখনো। আর শেষ পর্যন্ত মাসিমা এসে হয়তো মা-কে বলছেন, তা হলে ছেলেবেলার সেই কথাটাই থাকুক দিদি। খোকনের সঙ্গেই পুতুলের বিয়েটা দিয়ে দিই।

মা বলছেন, সে তো সবচেয়ে ভালোই হয় দিদি। কিন্তু ওই যে খুঁত রয়েছে একটুখানি? আমার ছেলেটার যে চোখ নেই?

ঃ চোখ নেই তো কী হয়েছে? বিদ্যে রয়েছে, বুদ্ধি রয়েছে—চমৎকার স্বভাব। তার ওপর কত রোজগার করে। অমন ছেলে যে লাখে একটি পাওয়া যাবে না সারা দেশে!

ঃ তা বটে, তা বটে!—মা-র গলাব স্বরে গর্ব উছলে পড়ছে: সে কথা ভাই বলতে পারো। কিন্তু পুতুলের মত হবে তো? হাজার ভালো হোক একটা খুঁত তো রয়েইছে!

মাসিমা এবার গলা নামিয়েছেন। হাসছেন অল্প অল্প।

ঃ তা হলে সত্যি কথা বলি দিদি। আমার মেয়ে কিন্তু তোমার ছেলেকেই পছন্দ করে বসে আছে। সেই ষোলো বছর আগে কী কথাই বলেছিলুম ভাই, প্রজাপতি ঠিক শুনে রেখেছেন। এবার ওদের—

আমি ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলুম। একি আকাশ-কুসুম তৈরী করছি ? এ রূপকথার চেয়েও অসম্ভব। সত্যিই যদি আমি ল-ক্লাসে ভর্তিও হই, যদি অ্যাডভোকেট হয়ে বেরিয়ে অনেক পশার করতে পারি—তা অন্তত দশ-বারো বছরের আগে নয়। ততদিন রঞ্জা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে ? তার জীবনে আসবে না কোনো উজ্জ্বল বলিষ্ঠ পুরুষ —যার চোখে দৃষ্টি আছে, বীরের শক্তি আছে যার দুই বাহুতে ? আর সে আমাকে ভালোবাসবে—এমন অদ্ভুত কল্প-কামনা পাগল ছাড়া কা'র মনেই বা জেগে উঠতে পারে ?

কিন্তু সেই চমকটা ক্রমশ আমার বুকের ভেতরে এমন করে ছড়িয়ে যাচ্ছে কেন ? আবার মাথায় একটা শিরাছেঁড়া তীক্ষ্ণ কুটিল যন্ত্রণা। গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি বিছানায় বুক পেতে শুয়ে পড়লুম।

জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বৃষ্টি নামবে বোধ হয়। এই বাতাসে আমার কাছে অনেক দূর—অনেক দিগন্তের যেন খবর আসে। মনে পড়ে কোথায় কেয়া ফুটেছে (রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর গানে কেয়া ফুল আমার চেতনায় ধরা দিয়েছে—কখনো আমি তা দেখিনি), কোথায় কামিনী ফুলগুলো ঝরে ঝরে বনের পথ ঢেকে দিয়েছে, গড়াই নদীর ঘোলা জল চর ডুবিয়ে, ফেনার ঘূর্ণি ছুটিয়ে কোন দূর-দূরান্তে ছুটে চলল। আর ধানের ক্ষেতে হাওয়া দিয়েছে, সবুজের সমুদ্র দুলছে মাইলের পর মাইল, এই বাতাস আমার সেই আশ্চর্য পৃথিবীর সন্ধান দিচ্ছে।

আঃ—বুকের যন্ত্রণাটা এমন বেড়ে উঠছে কেন ? এমনভাবে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চপে দিচ্ছে কে ?

না, ওসব কিছু নয়, আমার মনের ভুল। আমি আবার এক নতুন শৈশবের মধ্যে ফিরে যাচ্ছি, এক নতুন জীবন নিয়ে যেন বেঁচে উঠছি। যে অন্ধকার সেই পুরোনো নীলকুঠির অতলের মতো কালো ইঁদারাটা মুঠোমুঠো করে আমার চোখে ছড়িয়ে দিয়েছিল, সে অন্ধকার আবার সে ফিরিয়ে নিচ্ছে। আবার আমি যেন চোখ মেলেছি, আমার ছোট বৃত্তটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর রাশি রাশি আলোর ভেতর একাকার হয়ে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি গান :

'আকাশতলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল,
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক্‌-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল—'

না—অন্তরের আলোয় আমার আর মোহ নেই; যে কখনো আকাশ দেখেনি, রৌদ্র দেখেনি, রামধনু দেখেনি, যার চোখের সামনে দিয়ে কখনো শরতের নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে যায়নি, সে যা পায় তা-ই নিয়েই খুশি হোক। আমি সব পেতে চাই। একটা বৃত্তের জগতে নিজেকে নিয়ে আর আমি ভোলাতে পারছি না; ছেলেবেলার পুতুল খেলার দিন আমার আর নয়। আমার যে যৌবন, যে পরিণত দেহ, আমার যে শিরা-স্নায়ু একটা নিশ্চেতনার ঘোরে এতকাল তলিয়ে ছিল, মুহূর্তে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রঞ্জা তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। মেঘের ফেনার মতো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সেই শরীর আমাকে যে ক্ষণস্পর্শ দিয়েছিল, তাতে আমি পরিপূর্ণ যৌবনে জেগে উঠেছি। অলস কল্পনার রূপকথায় নয়—জীবনের মধ্যে আমি বেঁচে উঠব। সবাই যা পায়, তা-ই পাব, সংসারে সকলের জন্যে যা আছে, আমারই বা তাতে কেন ভাগ থাকবে না?

অপেক্ষা করো রঞ্জা, অপেক্ষা করো। সময় দাও—সুযোগ দাও আমাকে। আমি অ্যাড্‌ভোকেট হবো—কৃতী হবো—যাবো ইয়োরোপে। শুনেছি, বিজ্ঞানের আজ জয়-জয়কার, শুনেছি মানুষের আজ অসীম শক্তি। আজ আর কেউ কোথায় হারের দলে বসে চোখের জল ফেলে না। আমি ইয়োরোপে যাব, গ্রাফটিং করিয়ে বসিয়ে নেব নোতুন চোখ। রঞ্জা, তোমাকে আমি দেখব, টনটুনকে দেখব, মাকে দেখব, দেখব এই আশ্চর্য বিরাট কলকাতাকে। তখন বলব, রঞ্জা, তোমার আর আমার মাঝখানে আর কোনো বাধা নেই। শুধু দশ বছর—দশ বছর আমায় সময় দাও। মানুষ তো

মানুষের জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করে, তুমি কি এইটুকু মাত্র সময় আমাকে দিতে পারো না ?

এখুনি যেতে হবে কাকার কাছে। গিয়ে বলতে হবে, আর একটা মুহূর্তও আমি নষ্ট করতে পারব না। কাল—কালই আমায় ল-কলেজে ভর্তি হতে হবে। এক টুকরো আলোর খেলাঘরে পুতুল নিয়ে খেলা করার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু বুকে ক্রমাগত এমন করে চাপ দিচ্ছে কে ? সেই নীলকুঠির ইঁদারার অলক্ষ্য সাপটা—যে তার দুটো হিংস্র চোখ দিয়ে আমার চোখ কেড়ে নিয়েছে; সে-ই তার বজ্র চাপ দিয়ে পাকে আমাকে বাঁধতে চাইছে, ভেঙে দিতে চাইছে আমার পাঁজরাগুলো ; মাথার ভেতরে যে যন্ত্রণার আগুন ছুটছে, সে আর কিছু নয়, তারই একটার পর একটা হিংস্র ছোবল এসে পড়ছে সেখানে। আমি ওর চক্রান্ত বুঝতে পেরেছি সব। স্মৃতির একটুখানি খেলাঘরে একটা পুতুল দিয়ে ও-ই আমায় ভুলিয়ে রেখেছে এতদিন। কিছুতেই জাগতে দেবে না—কিছুতেই আমায় আলোর মধ্যে বাঁচতে দেবে না।

কিন্তু আমি বাঁচব। আমি জেগে উঠব আকাশভরা সূর্যতারার মধ্যে—আমার পরিপূর্ণ ছাব্বিশ বছরের যৌবনে। রঞ্জাকে দাবি করব, তাকে আমার করে নেব। বেরিয়ে আসব সেই সাপটার চক্রান্ত থেকে—তার নাগপাশ ছিঁড়ে, পাতালপুরীর কালো অন্ধকারপার হয়ে।

—সোনা দা !

টুনটুনের গলা শুনতে পাচ্ছি : সোনা দা, অবেলায় এমন করে শুয়ে আছো কেন ? দ্যাখো—কে এসেছে !

আমি উঠতে চাইলুম, সাড়া দিতে চাইলুম, কিন্তু সেই কালো শত্রুটা শক্ত করে পাক দিচ্ছে আমার কণ্ঠনালীতে। কিন্তু হার আমি মানব না। না—না !

—সোনার দা, রঞ্জা দি এসেছে।

রঞ্জা এসেছে। তবে আর দেরী নয়। আমার কথা ওকে এখুনি বলতে হবে। আমার প্রতিজ্ঞার কথা—আমার আশার কথা। ওকে

এই মুহূর্তেই বলতে হবে, মাত্র দশ বছর অপেক্ষা করো রঞ্জা, পুরুষের সব ঐশ্বর্য নিয়ে আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াব।

প্রাণপণে—সেই অসহ্য নাগপাশ ছিঁড়ে আমি উঠে দাঁড়াতে চাইলুম।

কিন্তু পায়ের নীচে মাটিটা কোথায় গেল? আমি কি সমুদ্রের ওপর দাঁড়িয়েছি? আমি কি ডুবে যাচ্ছি? আমি কি তলিয়ে যাচ্ছি কোনো নিঃসীম অতলে?

—সোনা দা—সোনা দা—সোনা দা—

—হিরণ দা—

কে ডাকছে? টুনটুন? রঞ্জা? কে কেঁদে উঠল? ঘরে কারা এসেছে আরো? মা? কাকা? কারা আমায় ডাকছে? এই যে আমি—এই তো আমি। সাড়া দিতে চাই—কিন্তু কথা বলতে পারছি না কেন? আর এত অন্ধকারই বা কেন? আমি—আমি কি তবে মরে যাচ্ছি? না—মরব না, কিছুতেই মরব না। আমি যে আবার নতুন করে শুরু করতে চলেছি। আমার প্রথম যৌবন আমায় জাগিয়েছে। রঞ্জাকে আমি পাবই। সেই ষোলো বছর আগে তা ওপর যে অধিকার আমি অর্জন করেছিলুম, সেই অধিকারের জোরে তাকে আমি জয় করে নেব।

আঃ—আঃ। বুকের সমস্ত চাপটা এক মুহূর্তে সরে যাচ্ছে। আমি মুক্তি পেয়েছি। ধানক্ষেত থেকে ভিজে বাতাস আসছে, কেয়ার গ পাচ্ছি—চোখের সামনে গড়াই নদীর ভরাজল ছলছল করে ফুে উঠল! ওই তো বিকেলের রঙ ডাঙায় মেখে বকেরা উড়ে চলল আলো—আলো—অফুরন্ত আলো! রঞ্জা, আমি চোখ ফি পেয়েছি—রঞ্জা, তোমার মেঘের ফেনার মতো শরীর আমায় ঘি ধরেছে, আমি বেঁচেছি—আমি বাঁচলুম।

"আকাশ তলে উঠল ফুটে আলোর শতদল"—

—*—